বিপদ
যখন
নিয়ামাত

"... আর তোমাদের ওপর যদি কোনো বিপর্যয় আসে, তবে এমনটা বলবে না যে—ইশ, যদি এমনটা না করতাম, তা হলে তো আজ এমন পরিণাম ভুগতে হতো না। বরং বলবে, আল্লাহ (তাকদীরে) যা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তা-ই হয়েছে। 'যদি' কথাটা শয়তানের দরজা খুলে দেয়।"

(মুসলিম, আস সহীহ, হাদীস : ৬৪৪১)

বিপদ যখন নিয়ামাত

লেখক

শাইখ মূসা জিবরীল

উসতাদ আলি হাম্মুদা

উসতাদা শাওয়ানা এ. আযীয

“ যখন বিপর্যয় আসবে তখন আল্লাহর বান্দারা যেন হতাশ না হয়ে যায়। আবার আল্লাহ যখন তাদেরকে ভালো কোনো নিয়ামাত দান করেন, তারা যেন এর ফলে অহংকারী বা উদ্ধত না হয়ে যায়। কারণ, প্রত্যেক বিপর্যয়—যা তার সাথে ঘটে—এর সবকিছুই তো পূর্বনির্ধারিত। অন্যদিকে বান্দার অর্জন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও আল্লাহরই অনুকম্পা। তাই, বান্দার যা পাওয়ার ছিল তা কখনও তাকে ছেড়ে যাবে না। আর যে জিনিস তাকে ছেড়ে যাবে, তা আসলে কখনও তার পাওয়ারই ছিল না। ”

“ প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরেই কিছু অস্থিরতা বিদ্যমান যা শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই নির্মূল করা সম্ভব। প্রত্যেকের অন্তরেই একাকীত্বের অনুভূতি বিদ্যমান যা শুধুমাত্র আল্লাহর নৈকট্যলাভেই দূর করা সম্ভব। প্রতিটা অন্তরে ভয় এবং উদ্বেগ বিদ্যমান যা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে ছুটে যাওয়ার মাধ্যমেই কাটানো সম্ভব। আর অন্তরে কিছুটা দুঃখানুভূতি বিদ্যমান যা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমেই অপসারণ করা সম্ভব। ”

“ দুআ ওপরের দিকে উঠতে থাকে, বিপদ নিচের দিকে নামতে থাকে এবং মাঝপথে তারা একে অন্যের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এ লড়াইয়ে বিজয় নির্ভর করে কে বেশি শক্তিশালী তার ওপর। ইখলাস ও কবুলিয়াতের আশা নিয়ে করা দুআ বিপদের ওপর প্রবল হয়, বিজয় লাভ করে এবং তখন বিপদ আর সংঘটিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে অমনোযোগের সাথে, হতাশা নিয়ে করা দুআ থেকে বিপদ শক্তিশালী হয়। তখন বিপদ দুআকে পরাজিত করে নিচে নেমে আসে। কখনও কখনও তারা সমানে সমান হয় আর কিয়ামাত পর্যন্ত একে অন্যের সাথে লড়তে থাকে। ”

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

জীবনে চলার পথে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত নানা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়। আর দ্বীন পালনের পথটা তো আরও বেশি বিপদসংকুল। বিপদের সময় সালাফদের ঈমান বেড়ে যেত, অথচ আমাদের ঈমান তখন নিভু নিভু হয়ে যায়। অনেকে তো সামান্য বিপদে পড়েই দ্বীন-পালনে বিতৃষ্ণ হয়ে যান, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল হারিয়ে ফেলেন, তাকদীরে বিশ্বাসের ভীত হয়ে পড়ে নড়বড়ে।

বিপদ বেশিরভাগ সময়ই আবির্ভূত হয় পরীক্ষারূপে। আমাদের একটু সতর্কতা বিপদরূপী সেই ঘন কালো মেঘকে রহমতের বারিধারায় পরিণত করতে সক্ষম। অন্যদিকে আমাদের সামান্য অসতর্কতার দরুন সেই বিপদ কালবৈশাখীর রূপ ধারণ করতে পারে, ধ্বংস করে দিতে পারে আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত। আর শাস্তিরূপী বিপদের আগমন তো নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য নিয়ামাত। কেননা দুনিয়ার সামান্য কষ্টভোগ জাহান্নামের অসহনীয় শাস্তির পরিপূরক হয়ে যায়।

সর্বোপরি, আমাদের সম্পূর্ণ উম্মাহ-ই আজ বিপদের ঘোর অমানিশায় দিন কাটাচ্ছে। সাফল্যের সূর্যোদয় তখনই হবে, যখন আমরা সেই বিপদরূপী অন্ধকারের স্বরূপ অনুধাবন করতে পারব। এ বইয়ে সেই অন্ধকার কাটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু দিঙ্‌নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে, যাতে আমরা কঠিনতম বিপদের মুহূর্তেও অবিচল থাকতে পারি।

বিপদের বাস্তবতা, বিপদের পরিচয় ও ফযীলত এবং পরীক্ষার সময় অবিচল থাকার উপায়সমূহ এই বইয়ের প্রধান আলোচ্য-বিষয়। বিপদ এবং দুঃখ-দুর্দশার সময়

কীভাবে একজন মুসলমান সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, উত্তম আচরণ এবং দৃঢ় মানসিকতার দ্বারা সবচেয়ে উত্তম পুরস্কার অর্জন করে নিতে পারে, তা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এ বইয়ে যাদের রচনা অনূদিত হয়েছে তারা হচ্ছেন :

- শায়খ মূসা জিবরীল (আলেম ও খতিব, শায়খ আহমাদ বিন মূসা জিবরীলের পিতা)।
- শাওয়ানা এ আযীয (প্রতিষ্ঠাতা, কুরআন সুন্নাহ রিসার্চ অ্যাকাডেমি হায়দ্রাবাদ)।
- উস্তাদ আলি হাম্মুদা (আলেম, দ্বায়ী ও লেখক)।

উল্লেখ্য, অনুবাদের স্বার্থে অনেক সময়ই মূল লেখার সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্য রাখা সম্ভব হয়নি। জটিল বক্তব্যকে বোধগম্য করার জন্য বেশিরভাগ সময়ই ভাবানুবাদের প্রয়োজন ছিল। তাই অনুবাদের ত্রুটিজনিত দায়ভার আমাদের। তা ছাড়া আল্লাহর কিতাব—আল কুরআনুল কারীম—ছাড়া আর কোনো গ্রন্থই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই এই বইয়ের কোনো অসঙ্গতি নজরে এলে তা আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। এ বইয়ের যা-কিছু ভালো, তা আল্লাহর তরফ থেকে। আর যা-কিছু মন্দ, তার দায়ভার আমাদের। আশা করি এ বই, আঁধার কাটিয়ে সামান্য হলেও আলোকবর্তিকার সন্ধান দেবে, হতাশাগ্রস্ত অন্তরে জ্বালবে আশার মশাল।

মুহাম্মাদ বিন আবদুল ফাত্তাহ
বিনতে ইবরাহীম

জীবন মানেই পরীক্ষা

অমুসলিমদের চোখে দুঃখ-দুর্দশা হচ্ছে অতিশয় যাতনার ব্যাপার। কিন্তু মুসলিমদের জন্য দুনিয়াবি কষ্টগুলো হচ্ছে এক ধরনের পরীক্ষা, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করে নেওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ। মহামহিম আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কখনও স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করে পরীক্ষা করেন।

আবার কখনও তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য বিপদের মধ্যে ফেলেন। একজন মুমিন ব্যক্তি যদি বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করতে পারেন, তা হলে দয়াময় আল্লাহ তাকে অজস্র পুরস্কার দান করবেন, তার পাপ মোচন করে দেবেন এবং জান্নাতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

“এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে : নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হিদায়াত-প্রাপ্ত।”[১]

---

[১] সূরা বাকারাহ, ০২ : ১৫৫-১৫৭

পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীরা তো এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্ষতির মাঝে ডুবে আছে। কারণ তারা যে ধৈর্য ধারণ করে, তার বিনিময়ে তাদের কোনো প্রতিদান পাওয়ার আশা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

“যদি তোমরা কষ্ট পেয়ে থাকো (তবে জেনে রাখো), তারাও তো তোমাদের মতোই কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু তোমরা আল্লাহর কাছে আশা করো (পুরস্কার এবং জান্নাতের), যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।”[১]

জীবনে আরাম-আয়েশ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এলে একজন মুসলিমের উচিত সবার আগে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। দুনিয়াবি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে কারও এমন ভাবা উচিত হবে না যে, তার ধার্মিকতা ও সদাচারের কারণেই তাকে এত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া হয়েছে। কারণ, দুনিয়াবি বিপদ-আপদই জগতের একমাত্র পরীক্ষা নয়। বরং দুনিয়াবি সমৃদ্ধি, সম্পত্তি আর শারীরিক সুস্থতাও তো এক ধরনের পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

“...আমরা তোমাদের মন্দ ও ভালো (এ উভয়) অবস্থার মধ্যে ফেলেই পরীক্ষা করি।”[২]

এর মানে হচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে কখনও দুরবস্থার মধ্যে ফেলে পরীক্ষা করবেন, আবার কখনও স্বচ্ছলতার মধ্যে রেখে পরীক্ষা করবেন; যাতে তিনি যাচাই করতে পারেন—কারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে আর কারা অকৃতজ্ঞ হয়, কারা ধৈর্যধারণ করে আর কারা অধৈর্য হয়ে পড়ে।

আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ বর্ণনা করেন যে, ইবনু আব্বাস ﷺ বলতেন, “আল্লাহ তোমাদের কখনও বিপদে ফেলে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও আরাম-আয়েশে রেখে পরীক্ষা করবেন। কখনও সুস্বাস্থ্য দান করে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও রোগাক্রান্ত করে পরীক্ষা করবেন। কখনও সম্পত্তি দ্বারা পরীক্ষা করবেন আবার কখনও দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে পরীক্ষা করবেন। কখনও হারাম জিনিস দিয়ে

[১] সূরা আন নিসা, ০৪ : ১০৪
[২] সূরা আল আম্বিয়া, ২১ : ৩৫

পরীক্ষা করবেন আবার কখনও হালাল জিনিস দিয়ে। কখনও আনুগত্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও গুনাহের মাধ্যমে। কখনও হিদায়াতের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন আবার কখনও কক্ষচ্যুত করে পরীক্ষা করবেন।"[১]

[১] ইবনু কাসীর, তাফিসরুল কুরআনীল আযীম

নিয়তির বিধান

দুনিয়াতে এমন কিছুই ঘটে না যা লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত কিতাবে লিখিত নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই গ্রন্থে তাঁর সৃষ্টির জীবিকা, জীবনোপকরণ, জীবন-মৃত্যু, আমল ইত্যাদি সবকিছুই সংরক্ষণ করে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة

“আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজগতের পরিমাপ লিখে রেখেছেন।”[১]

অনুরূপভাবে বান্দার ওপর ঘটে যাওয়া প্রত্যেক বিপদ-আপদ বস্তুত নিয়তিরই বিধান, যা আল্লাহ তাআলা পূর্বনির্ধারিত করে রেখছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

“পৃথিবীতে অথবা (ব্যক্তিগতভাবে) তোমাদের ওপর যখনই কোনো বিপর্যয় আসে; তাকে অস্তিত্ব দান করার (বহু) আগেই তা (-র বিবরণ) একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে অত্যন্ত সহজ। এটা

---

[১] নিশাপুরি, আল মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন : ২/২৬০

এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে বেশি উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[১]

সূরা হাদীদের পরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ সবকিছু পূর্বনির্ধারিত করে রাখার পেছনের হিকমাহ বর্ণনা করেছেন। যখন বিপর্যয় আসবে তখন আল্লাহর বান্দারা যেন হতাশ না হয়ে যায়। আবার আল্লাহ যখন তাদেরকে ভালো কোনো নিয়ামাত দান করেন, তারা যেন এর ফলে অহংকারী বা উদ্ধত না হয়ে যায়। কারণ, প্রত্যেক বিপর্যয়—যা তার সাথে ঘটে—এর সবকিছুই তো পূর্বনির্ধারিত। অন্যদিকে বান্দার অর্জন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও আল্লাহরই অনুকম্পা। তাই, বান্দার যা পাওয়ার ছিল তা কখনও তাকে ছেড়ে যাবে না। আর যে জিনিস তাকে ছেড়ে যাবে, তা আসলে কখনও তার পাওয়ারই ছিল না। এই বিশ্বাস ইমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "ঈমান কী?" তিনি জবাব দিলেন,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ

> "আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাকুলের, তাঁর (আসমানি) কিতাবসমূহের, তাঁর রাসূলগণের, কিয়ামাত দিবসের এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস আনাই হচ্ছে ঈমান।"[২]

তাই আল্লাহর বান্দাদের অতি জল্পনা-কল্পনা বা অতিরিক্ত অনুমান করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। "আহা, আমি যদি এই কাজটি এভাবে না করে ওইভাবে করতাম, তা হলে হয়তো এমনটা হতো না" অথবা "ইশ, আমি যদি এই কাজটি করতাম, তা হলে আজ আমার এমন বিপদ হতো না"—ইত্যাদি কথা বলা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "...আর যদি তোমাদের ওপর কোনো (বিপর্যয়) আসে, তা হলে এমন কথা বলবে না যে, 'ইশ, যদি আমি এমনটি না করতাম, তা হলে আমার আজ এমন পরিণাম ভুগতে হতো না'; বরং বলবে, 'আল্লাহ (তাকদীরে) যা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তা-ই হয়েছে।' 'যদি' কথাটা শয়তানের দরজা খুলে দেয়।"[৩]

মহিমান্বিত আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান

---

[১] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২২, ২৩
[২] বুখারি, আস সহীহ, হাদীস : ৪৮
[৩] মুসলিম, আস সহীহ : ৬৪৪১

করবেন এবং হিদায়াতের পথে পরিচালিত করবেন, যদি তারা আন্দাজ-অনুমান থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বলেন,

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۝١١

“আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোনো বিপদ আসে না, আর যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।”[১]

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন, “‘আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন’-এর অর্থ হচ্ছে : আল্লাহ তার অন্তরকে নিশ্চয়তার দিকে পরিচালিত করবেন। তাই সে নিঃসংশয়চিত্তে বুঝতে পারবে যে, সে যা পেয়েছে তা কখনোই তাকে ছেড়ে যেত না। আর যে জিনিস সে পায়নি, তা কখনও তার হওয়ারই ছিল না।”[২]

ইমাম ইবনু কাসীর ﷺ তাঁর তাফসীরে লিখেন, “... যদি কোনো বিপদে যাতনা ভোগ করার পর আল্লাহর কোনো বান্দা বিশ্বাস রাখে যে, এটি আল্লাহর ফায়সালা ও নির্দেশমতোই ঘটেছে, আর সে যদি আল্লাহর থেকে প্রতিদানের আশায় ধৈর্যধারণ করে সেই কষ্ট সহ্য করে, তা হলে আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করার মাধ্যমে এবং ঈমানকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে তার কষ্টের ক্ষতিপূরণ দেবেন। সে যা-কিছু হারিয়েছে তার পরিবর্তে আল্লাহ তাকে সে জিনিসের সমপরিমাণ অথবা এর চেয়েও ভালো কিছু তাকে দান করবেন।”

[১] সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১১
[২] তাবারি, আত তাফসীর : ২৩/৪২

ভরসা রাখুন আল্লাহর ওপর

একজন মুসলিমের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্যে যা-কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার সবকিছুই বান্দার কল্যাণের জন্য; চাই তা ভালো হোক কিংবা মন্দ, স্বস্তিদায়ক কিংবা যাতনাময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> "শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার প্রাণ! আল্লাহ মুমিনদের জন্য এমন কোনো বিষয় নির্ধারণ করেন না, যাতে তার উপকার নেই। আর এই বিশেষত্ব মুমিনগণ ছাড়া আর কারও জন্যেই নয়।"[১]

প্রতিটি দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-আপদের পেছনে আল্লাহর হিকমাহ সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা আমাদের মানবিক বুদ্ধিমত্তার পক্ষে অসম্ভব। কারণ মানুষের জ্ঞান তো শুধু দৃশ্যমান বিষয়গুলোতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান—শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে আর তা বান্দাকে কীভাবেই-বা উপকৃত করবে—এই সংক্রান্ত প্রজ্ঞা তো শুধুমাত্র আল্লাহই রাখেন।

অনেক সময় কোনো বিপদ আপাতদৃষ্টিতে ভয়াবহ মনে হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়তো কল্যাণকর বলে প্রমাণিত হবে। আল্লাহ বলেন,

عَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦

---

[১] মুসলিম, আস সহীহ

“তোমাদের কাছে হয়তো কোনো বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো-বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।”[১]

তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট হতে উত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশা করা। এবং সেই সাথে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও ফায়সালার ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখা।

আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, যদি মুমিনগণ তাদের রবের প্রতি ভরসা করতে পারে তা হলে আল্লাহই তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

“যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন।”[২]

কুরআন আমাদেরকে নবি ইয়াকূব ﷷ-এর আল্লাহর প্রতি ভরসার অনুপম দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। ইয়াকূব ﷷ-এর সন্তানেরা অত্যন্ত সুদর্শন ছিল। তাই মিশরে পাঠানোর সময় তাদেরকে তিনি আলাদা আলাদা প্রবেশপথে ঢোকার আদেশ দেন। কারণ তিনি তাদের জন্যে বদনজরের ভয় করছিলেন।

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

“ইয়াকূব বললেন : হে আমার বৎসগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কোরো। আল্লাহর কোনো বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই ওপর আমি ভরসা করি এবং ভরসাকারীদের তাঁরই ওপর ভরসা করা উচিত।”[৩]

এর মাধ্যমে তিনি হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলেন, যদিও আমার সাবধানতা আল্লাহর

[১] সূরা বাকারাহ, ০২ : ২১৬
[২] সূরা তালাক, ৬৫ : ৩
[৩] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৬৭

সিদ্ধান্ত ও নির্ধারিত ফায়সালাকে আটকাতে পারবে না, তবুও আমি আল্লাহর প্রতি এই বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ যে ফায়সালা করবেন সেটাই সর্বোত্তম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, মুমিনদের সর্বদা আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। বান্দার জীবনে যখন আনন্দ আর স্বচ্ছলতা আসবে, তখন তার আল্লাহর শোকর করা উচিত এবং সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। আর যখন জীবনে বিপদের ঘনঘটা নেমে আসবে, তখন বান্দার উচিত সবর করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

'মুমিনের বিষয়াদি কত আশ্চর্যের! তার সবকিছুই কল্যাণকর। আর এটা তো কেবল মুমিনের ক্ষেত্রেই হতে পারে। স্বচ্ছলতায় সে শুকরিয়া আদায় করে, তখন তা তার জন্যে কল্যাণকর হয়। আর যদি তার ওপর কোনো বিপদ নেমে আসে তা হলে সে সবর করে, ফলে তাও তার জন্যে কল্যাণকর হয়ে যায়।'[১]

বিপদের সময় ধৈর্যহীন হয়ে পড়া, অস্থিরতা দেখানো, অতি উত্তেজিত হয়ে পড়া অথবা কোনো কথা বলা বা কাজ করা যাতে আল্লাহর ফায়সালার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ পায়—এমন কোনো কাজই আমাদের জন্য বৈধ নয়।

তাই বিলাপ করে কাঁদা, কাপড় ছিঁড়ে শোক পালন করা অথবা নিজের শরীরে আঘাত করা ইত্যাদি কাজ ইসলামে কঠিনভাবে নিষেধ। কিয়ামাতের দিন সবাইকে ওইসব নিষিদ্ধ কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যা সে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও করেছিল।

ইমাম বুখারি ﷺ তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবূ মূসা আল আশআরি ﷺ-এর সূত্রে লিপিবদ্ধ করেন যে, যারা বিপদের সময় বিলাপ করে কিংবা মাথা মুণ্ডন করে (শোক প্রকাশের প্রতীক হিসেবে) কিংবা কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, তাদের প্রত্যেকের থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এ ধরনের প্রত্যেকটি কাজই আলেমগণের ঐকমত্য (ইজমা) অনুসারে হারাম।

যেসব জিনিস বান্দার ক্ষমতার বাইরে, সেসব কাজের জন্যে কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাকে শাস্তি দেন না। উদাহরণস্বরূপ, কষ্টের সময় যখন অন্তর আবেগপ্রবণ হয়ে যায় তখন চক্ষুযুগল অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। অনবরত নির্গত হয় অশ্রুধারা। এ কান্নার

---

[১] মুসলিম, আস সহীহ : ২৯৯৯

ব্যাপারে বান্দার হয়তো কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকে না। সে হয়তো মূল্যবান কোনো বস্তু হারানোর কষ্টে বা প্রিয়জন হারানোর বেদনায় নিদারুণ বিরহের যন্ত্রণা ভোগ করছে। আল্লাহ সেই অশ্রু আর অন্তরের কষ্টদায়ক অনুভূতির জন্যে বান্দাকে শাস্তি দেবেন না।

তবে এমন কষ্টের সময় আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মনে কোনো খারাপ চিন্তার উদয় হওয়ার আগেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আবেগের আতিশয্যে এমন কোনো কথা বলা থেকে নিজ জবানের হেফাজত করতে হবে, যে কথা দ্বারা আল্লাহর ফায়সালার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবি সা'দ ইবনু উবাদাহ رضي الله عنه-কে দেখতে গেলেন। সা'দ رضي الله عنه তখন অসুস্থ ছিলেন। রাসূল ﷺ-এর সাথে কয়েকজন সাহাবিও ছিলেন। প্রিয় সাহাবি সা'দকে অসুস্থ দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ কেঁদে ফেললেন। রাসূল ﷺ-কে কাঁদতে দেখে সাহাবিগণও কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ

> "শুনে রাখো, চোখের পানি কিংবা অন্তরের দুঃখের জন্য আল্লাহ কখনও শাস্তি দেন না, বরং শাস্তি তো দেন তিনি এটির কারণে (এ কথা বলে রাসূল ﷺ নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন)। নতুবা তিনি দয়া প্রদর্শন করেন।"[১]

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র ইবরাহীম মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন রাসূল ﷺ নিজ পুত্রের পাশে গেলেন। রাসূল ﷺ-এর চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ল। তা দেখে আবদুর রহমান ইবনু আউফ رضي الله عنه বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এমনকি আপনিও (সন্তানের মৃত্যুতে কাঁদলেন)!"

রাসূল ﷺ তখন জবাব দিলেন, "ও ইবনু আউফ! এটি তো দয়া।"

তারপর তিনি আরও কাঁদলেন এবং বললেন,

(إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)

[১] মুসলিম, আস সহীহ : ২০২২

‘আঁখি অশ্রুসিক্ত হয় এবং অন্তর ভারাক্রান্ত হয়। তবু আমরা এমন কিছুই বলি না, যাতে আমাদের রব অসন্তুষ্ট হন। হে ইবরাহীম! তোমার বিদায়ে আমরা দুঃখভারাক্রান্ত।”[১]

[১] বুখারি, আস সহীহ, ১৩০৩

বিপদ : কখন পরীক্ষা আর কখন শাস্তি?

যখন কেউ আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন কিংবা ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়, তখন সেই বিপদ হচ্ছে পরীক্ষা। উদাহরণস্বরূপ, কোনো মুজাহিদ যখন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে আহত হন, কোনো মুহাজির যখন হিজরত করতে গিয়ে সম্পত্তি হারান, সুন্নতের অনুসরণ করতে গিয়ে বা ইসলামের বিধান মানতে গিয়ে যখন কারও চাকরি চলে যায়—তখন এ ধরনের বিপদ হচ্ছে পরীক্ষা। যারা এ ধরনের বিপদে সবর করবে, তারা উত্তম বিনিময় পাবে। আর যারা অসন্তোষ প্রকাশ করবে, তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবে।

গুনাহের কাজ করতে করতে যখন কেউ দুর্দশার শিকার হয়, তখন এটি আযাব। উদাহরণস্বরূপ, মদ বা অন্যকোনো নেশাদ্রব্য গ্রহণের কারণে কেউ যখন অসুস্থ হয়ে যায়, তখন তা আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি। এমতাবস্থায় সাথে সাথে গুনাহ ত্যাগ করতে হবে। তাওবা ও ইসতিগফার করে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর না হলে জেনে রাখা উচিত, কিয়ামাতের শাস্তি এর চেয়ে আরও অনেক ভয়াবহ, যন্ত্রণাদায়ক আর অসহ্য হবে।

অনেক সময় বিপদ-আপদের সাথে নেকির কাজ বা গুনাহের কাজের সরাসরি কোনো সম্পর্ক থাকে না। যেমন কেউ রোগাক্রান্ত হলো, সন্তান হারাল কিংবা ব্যবসায় ক্ষতির শিকার হলো। এমতাবস্থায় একজন মুসলিমের উচিত নিজের আমলের পর্যালোচনা করা। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমলের ফলস্বরূপ বিপদ দেওয়া হয়। অথবা, অনেক সময় আল্লাহ বান্দার ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্যে বিপদ দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ . وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ

‘কিয়ামাতের ময়দানে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ধনাঢ্য ও সুখী ছিল এমন এক জাহান্নামী ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে অল্প সময় ঢুকিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনও দুনিয়াতে সুখ-শান্তিতে ছিলে? তুমি কি কখনও দুনিয়ার নিয়ামাত পেয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম! হে আমার রব! আমি কখনও দুনিয়াতে শান্তি পাইনি। ঠিক তদ্রুপ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি সর্বাধিক কষ্ট ও অশান্তিতে ছিল এমন এক জান্নাতি ব্যক্তিকে আনা হবে তারপর তাকে অল্প সময়ের জন্য জান্নাতে ঢুকিয়ে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনও অভাব অনটনে ছিলে? সে আল্লাহর কসম করে বলবে, না, আমি কখনও কোনো অভাব-অনটনে বা কষ্টে ছিলাম না।’[১]

সর্বদা স্মরণে রাখবেন :

- দুঃখ-কষ্ট আর সুখ-শান্তি সবই পরীক্ষা।
- আল্লাহ আপনার জন্যে ভালো-মন্দ যা-কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাতেই আপনার মঙ্গল আছে।
- আপনার সাথে যা ঘটেছে, তা কখনোই আপনাকে ছেড়ে যেত না। আর যা আপনার সাথে ঘটেনি, তা কখনও আপনার সাথে ঘটারই ছিল না।
- সবর মুমিনের একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ।
- যারা আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে ও সবর করে, তারা উত্তম প্রতিদান পায়।
- অধৈর্য হওয়া, বিলাপ করা, হা-হুঁতাশ করার মাধ্যমে কখনোই আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালা বদলে যায় না।

---

[১] মুসলিম, আস সহীহ : ৬৯৮১

- মানুষের কাছে নিজের বিপদের ব্যাপারে নালিশ জানানো সবরের বিপরীত কাজ।
- একমাত্র আল্লাহই পারেন আপনাকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে এবং আপনার কষ্ট দূর করতে।

আমাদের দু-হাতের কামাই

বিপদ আসে মুমিন বান্দার জন্য পরীক্ষা হয়ে, যাতে সে সবর করতে পারে আর আল্লাহর ফায়সালার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারে। তবে অনেক সময়েই মুমিন বান্দাদেরকে বিপদ দেওয়া হয় তাদের গুনাহ ও মন্দ কাজের প্রতিফল হিসেবে। এগুলো হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি। আল্লাহ বান্দাদের মনে করিয়ে দেন যে, তাদের উচিত তাদের মন্দ কাজগুলো পরিত্যাগ করা আর আল্লাহর নিকট তাওবা করা।

আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۝٣٠

“তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।”[১]

দুনিয়াবি বিপদের এ বাস্তবতা সঠিকরূপে বোঝা এবং তাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া অত্যাবশ্যক। কুরআন এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ পূর্ববর্তী অনেক জাতিকে নাফরমানির কারণে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ সকল জাতির লোকেরা আল্লাহর সতর্কবার্তা শোনেনি। ফলস্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে প্রবল শাস্তি দিয়েছেন।

নূহ ﷺ-এর সময়কার অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ মহাপ্রলয়ংকরী প্লাবনে ডুবিয়ে শাস্তি দিয়েছেন। হূদ ﷺ-এর কওমকে প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা উৎখাত করেছেন।

---

[১] সূরা শুরা, ৪২ : ৩০

সালিহ ﷺ-এর অহংকারী কওমকে প্রচণ্ড ভূকম্পনের দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। লূত ﷺ-এর কওমকে আল্লাহ তাআলা চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত করেন। তাদের সমগ্র এলাকা উলটিয়ে দেন, আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করে সমগ্র জাতিকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেন।

এগুলো-সহ কুরআনে বর্ণিত অতীতের জাতিগুলোর অন্যান্য কাহিনি আমাদেরকে সতর্ক করে দেয় আর জানিয়ে দেয় যে, আল্লাহর নাফরমানি করতে থাকলে, আল্লাহর সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করলে কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে।

আল্লাহ বলেন,

لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

> “রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মতো গণ্য কোরো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।”[১]

শাস্তির রয়েছে রকমফের। শাস্তি আসতে পারে নানারূপে। সম্ভবত বর্তমান সময়ে মানবজাতির ওপর আপতিত সবচেয়ে সুস্পষ্ট শাস্তি হলো এইডস। আশির দশক থেকে এইডসের আবির্ভাব। এইডস হচ্ছে এইচ.আই.ভি. নামক ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট একটি ব্যাধি, যা মানুষের শরীরের রোগ-প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস করে দেয়। এতে করে একজন এইডস-রোগী খুব সহজেই যে-কোনো সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটাতে পারে।

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণত কয়েক বছরের মধ্যেই মারা যায়। এইডসের ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ হচ্ছে—লাগামছাড়া যৌনসম্পর্ক, সমকামিতা এবং মাদকাসক্তির প্রসার। এই প্রত্যেকটি কাজই এমন, যা আল্লাহর বেঁধে দেওয়া সীমারেখা অতিক্রম করে।

অনেকে হয়তো বলবে, এইডস তো শুধুমাত্র গুনাহগার লোকদেরই হয় না। অনেক সময় চরিত্রবান মানুষও এইডস আক্রান্ত হয়। এ কথার জবাবে কুরআন

[১] সূরা নূর, ২৪ : ৬৩

জানাচ্ছে—যখন আল্লাহর গজব আপতিত হয়, তা শুধু গুনাহগারদেরই আক্রান্ত করে না, বরং সমগ্র সমাজ এতে আক্রান্ত হয়। আল্লাহ বলেন,

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

“আর তোমরা এমন ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো, যার শাস্তি তোমাদের মধ্যে যারা জালিম শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর শাস্তি দানকারী।”[১]

শুধু এইডস নয়, মানবজাতিকে আজ অসংখ্য ব্যাধি ও বিপর্যয় গ্রাস করেছে। বর্তমানে আমরা প্রতিনিয়ত শুনতে পাই নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা। অপ্রত্যাশিত বন্যা-ঝড়-তুফান-ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত আঘাত হানছে।

আজ মুসলিম উম্মাহ জালিমদের অত্যাচারে জর্জরিত। এগুলোও আমাদের জন্য শাস্তিদায়ক স্মরণিকা। আমরা আল্লাহর নাফরমানি করার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে অভাব-অনটন আর বিপদ-আপদ দিয়ে আক্রান্ত করে রেখেছেন, আমাদের ওপর জালিমদের চাপিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ আমাদের সতর্ক করছেন। জেনে রাখুন, এগুলোর একমাত্র সমাধান হলো আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকা, নিজেকে ইসলামের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখা, হারামে লিপ্ত না হওয়া।

আল্লাহ বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।”[২]

আমাদেরকে এসব সতর্কবার্তার ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত। আল্লাহর নিকট তাওবা-ইসতিগফার করা উচিত। এমন কাজ পরিহার করা উচিত,

---

[১] সূরা আনফাল, ০৮ : ২৫

[২] সূরা রোম, ৩০ : ৪১

যা আমাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। আমাদের উচিত কল্যাণের কাজে অগ্রসর হওয়া, যাতে আমরা আমাদের রবের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই আমাদের আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। নতুবা আমরা আল্লাহর গজব থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারব না।

বিপদ যখন নিয়ামাত

কোনো মুসলিম যখন বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহর নিকট নিজেকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে, তখন সেই বিপদ তার জন্যে নেকির এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কারণ হয়। আর যদি সে অসন্তোষ প্রকাশ করে, অধৈর্য হয়ে যায়, তখন তা তার জন্য আল্লাহর গজব এবং শাস্তি নিয়ে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إن عِظَمَ الجزاءِ مع عِظَمِ البلاءِ، وإن الله -تعالى- إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رَضِيَ فله الرِضا، ومن سَخِطَ فله السُّخْطُ

'বিপদ যত কঠিন হয়, পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ কোনো জাতিকে ভালোবাসলে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান; আর যে তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান।'[১]

তা হলে বিপদ কি নিয়ামাত নাকি শাস্তি? আমরা বলব, এটি নির্ভর করে আল্লাহর বান্দার আমলের ওপর। যদি সে বিপদকে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের একটি সুযোগ হিসেবে নেয় এবং সে সুযোগ কাজে লাগায়, তা হলে বিপদ তার জন্যে নিয়ামাত। নতুবা, বিপদ তার জন্যে শাস্তি। কষ্ট-যাতনা সত্ত্বেও বিপদ-আপদ মুমিনদের জন্য কিছু উপকার নিয়ে আসে। কষ্ট-যাতনাকে সহজভাবে বরণ করে নেওয়ার মাধ্যমে একজন মুসলমান ধৈর্য ও সহনশীলতার মহৎ গুণ অর্জন করতে পারে।

- কষ্ট মুমিনদেরকে ধৈর্যশীল হতে শেখায়। আল্লাহ তাঁর ধৈর্যশীল বান্দাদের অজস্র

[১] আলবানি, আস সহীহাহ : ১৪৬

পুরস্কার দান করেন।

- দুঃখ-দুর্দশা গুনাহগার মুসলিমদেরকে জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়—মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাকে মনে করিয়ে দেয় যে, সে যে-কোনো সময় মারা যেতে পারে। আল্লাহর নাফরমানি করতে করতে মারা গেলে তাকে যে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, সেই বোধোদয় ঘটে তার।
- যখন কেউ আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়, সে কারও উপদেশকে তেমন পাত্তা দেয় না। কিন্তু বিপদের সময় তার আল্লাহকে মনে পড়ে, পরকালের ভয়াবহ শাস্তির কথা স্মরণ হয়। আল্লাহ বলেন,

تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

“বড় শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।”[১]

তাই বিপদে পড়লে মানুষ নিজের গুনাহ ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণের অবকাশ পায়। ফলস্বরূপ, সে নিজের ভুলগুলো উপলব্ধি করতে পারে। তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে পারে। এভাবে, দুনিয়াবি বিপদ-আপদ একজন গুনাহগার বান্দার জন্যে নিয়ামাত হিসেবে আসে। গুনাহের কারণে মুমিনদেরকে পরকালে যে অসহনীয় ও অসহ্য শাস্তির যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, দুনিয়াবি বিপদ-আপদের কারণে সেই গুনাহের বোঝা হালকা হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

মুসলিম নর-নারীর ওপর ক্রমাগত বিপদ আসতেই থাকে, যতক্ষণ না তারা সম্পূর্ণ গুনাহমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হয়।'[২] রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন,

ما يُصيب المسلم من نَصب، ولا وصَب، ولا هَمّ، ولا حَزن، ولا أذى، ولا غَمّ، حتى الشوكة يُشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه

‘মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে-সকল যাতনা, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এসবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।'[৩]

[১] সূরা আস সাজদাহ, ৩২ : ২
[২] বুখারি, আস সহীহ
[৩] বুখারি, আস সহীহ : ২১৩৭

পরকালের অসহ্য কঠিন শাস্তির তুলনায় দুনিয়াবি কষ্ট-যন্ত্রণাগুলো তো কিছুই না। দুনিয়াবি কষ্টগুলো তো মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু পরকালের শাস্তিগুলো তো চিরস্থায়ী। পরন্তু, আল্লাহ তো আমাদের অধিকাংশ অবাধ্যতাগুলো দুনিয়াতেই ক্ষমা করে দেন। আমরা দুনিয়াতে যেসব কষ্ট ভোগ করি, তা তো আমাদের গুনাহের ক্ষুদ্র একটি অংশেরই প্রতিফল। দয়াময় আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۝

"তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন।"[১]

আমাদের প্রত্যেকটি গুনাহের কারণে আমাদেরকে যদি শাস্তি দেওয়া হতো, তা হলে সমগ্র পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যেত। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

"যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে (তখন তিনি তাদের পাকড়াও করবেন), আল্লাহ তাআলা বান্দাদের যাবতীয় কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন।"[২]

সুতরাং এটি তো আল্লাহর অসীম দয়া যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের অধিকাংশ গুনাহ মাফ করে দেন এবং পরকালের ভয়াবহ শাস্তির বদলে দুনিয়াবি জীবনের খণ্ডকালীন বিপদ-আপদ দিয়ে আমাদের গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

'আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার কল্যাণ চান, তখন দুনিয়াতেই তার শাস্তি দিয়ে দেন, আর যখন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান, তখন তার পাপগুলো রেখে দিয়ে কিয়ামাতের দিন তার প্রাপ্য পূর্ণ করে দেন।'[৩]

- বিপদ মুমিনদেরকে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুগত ও বিনয়ী করে তোলে।

---

[১] সূরা আশ শূরা, ৪২ : ৩০
[২] সূরা আল ফাতির, ৩৫ : ৪৫
[৩] তিরমিযি, আস সুনান, হাদীস : ২৩৯৬

উদাহরণস্বরূপ, কোনো মুসলিম যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন সে নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করতে পারে। জীবনে আল্লাহর প্রয়োজন অনুভব করে। সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, সুস্থতা লাভের পর তার রবের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যে আরও গভীরভাবে তখন সে আত্মনিয়োগ করে।

- যদি সে সব সময় সুস্থ জীবন কাটাত, যদি সে জীবনে কখনোই কোনো অসুস্থতা অথবা কষ্ট ভোগ না করত, তবে সে হয়তো অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে যেত। একইভাবে, যদি সে সব সময় রোগ-শোক আর কষ্টে জীবন কাটাত, সে আল্লাহর ইবাদাত করার কিংবা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার সুযোগই পেত না।

একজন বিশ্বাসী বান্দা বিপদ-আপদের ফলে এগুলো ছাড়াও আরও অনেক উপকারিতা লাভ করে। তা ছাড়া, দুনিয়াবি বিপদ-আপদ একজন মুসলিমের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্যেও অত্যাবশ্যক। কারণ বিপদের যাতনা সহ্য করার মাধ্যমে সে গুনাহ থেকে পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারে এবং সর্বোপরি বিপদের ঝাপটা সহ্য করে সে দ্বীন কায়েম করতে সমর্থ হয়। আর এ-কারণেই নবিগণ এবং তাঁদের অনুসারীগণ যখন বিপদের সম্মুখীন হতেন, তখন খুশী হতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> ‘সবচেয়ে বেশি বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখী হয়েছেন নবিগণ। তারপর ন্যায়নিষ্ঠ বান্দাগণ। তাঁদের মধ্যে কাউকে তো এত বেশি দারিদ্র্য দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে যে, শরীর ঢাকতে এক-টুকরো আবা (কমদামি উলের বস্ত্র) ছাড়া কিছুই ছিল না। আর নিশ্চয়ই তাঁরা বিপদ দেখে তেমনই সন্তুষ্ট হতেন যেমন তোমরা স্বচ্ছলতা দেখে হও।’[১]

---

[১] আলবানি, আস সহীহাহ : ১৪৪

বিপদ কামনা করা অনুচিত

দুনিয়াবি বিপদ-আপদের নানা উপকারিতা, পুরস্কার এবং এর বিনিময়ে পরকালের শাস্তি মাফের মহা-সুযোগ দেখে অনেকের কাছে মনে হতে পারে, দুনিয়াবি বিপদ ভোগ-করা এবং আল্লাহ্ যাতে বিপদে ফেলেন এমন প্রার্থনা করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু মুসলিমদেরকে বিপদ চেয়ে দুআ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ :

প্রথমত, বিপদসংকুল অবস্থায় যে-কোনো ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাত অস্বীকার করতে পারে, হয়ে যেতে পারে অবিশ্বাসী। আর তা ছাড়া নিজের গুনাহের সম্পূর্ণ ভার এই দুনিয়াবি জীবনে বহন করা আমাদের কারও পক্ষেই সম্ভবপর হবে না।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের বিশেষত্বই হচ্ছে ইসলাম সহজ এবং ক্ষমার ধর্ম। নিজের বিপদ চেয়ে প্রার্থনা করা তাই ইসলামের এই বিশেষত্বের সাথেই সাংঘর্ষিক। আমাদেরকে তো এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন নিজেদের কল্যাণ এবং গুনাহ মাফের জন্য দুআ করি। মহিমান্বিত আল্লাহ্ কুরআনে আমাদের এই দুআটি শিখিয়ে দিয়েছেন :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

“হে আমাদের পালনকর্তা! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী কোরো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের

ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ কোরো না—যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর অর্পণ করেছ। হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের ওপর ওই বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করো। আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো। তুমিই আমাদের (একমাত্র আশ্রয়দাতা) বন্ধু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্য করো।"[১]

তাই মুসলিমদের উচিত আল্লাহর দয়া গ্রহণ করা এবং আল্লাহর কাছে নিজের কৃত গুনাহের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। বিপদ চাওয়া কখনোই উচিত নয়। আনাস ﵁ বর্ণনা করেন যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক মুসলিমকে দেখতে গেলেন, সে এতই দুর্বল ছিল যে মুরগির বাচ্চার মতো (চিকন) হয়ে গিয়েছিল। রাসূল ﷺ তখন তাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি আল্লাহর কাছে কোনো বিশেষ দুআ করেছ অথবা বিশেষ কিছু চেয়েছ (যার ফলে তুমি এমন হয়ে গেলে)?"

সে জবাব দিল, "হ্যাঁ, আমি দুআ করেছি যে, হে আল্লাহ! তুমি পরকালে আমার জন্য যেসব শাস্তি রেখেছ, তা আমাকে এই দুনিয়াতেই দিয়ে দাও।" রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, "সুবহানাল্লাহ! তুমি তো তা সহ্য করতে পারবে না। বরঞ্চ তোমার এ কথা বলা উচিত ছিল :

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করো এবং আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো।"[২]

তারপর তিনি আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তির সুস্থতার জন্য দুআ করলেন আর আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দিলেন।"[৩]

[১] সূরা আল বাকারা, ০২ : ২৮৬
[২] সূরা বাকারাহ, ০২ : ২০১
[৩] মুসলিম, আস সহীহ

বিপদের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়

বিপদের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি, রহমত ও নৈকট্য অর্জন করা যায় এমন কিছু উপায় নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

- সবর : আরবি শব্দ 'সবর' এর মূল শব্দের অনুবাদ করলে তা বোঝায়, 'কোনো কিছুকে আটকে রাখা কিংবা কোনো কিছু হতে বিরত থাকা অথবা নিবৃত্ত থাকা।' ইসলামি পরিভাষায় 'সবর' এর অর্থ হচ্ছে, 'হতাশা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হওয়া থেকে বিরত থাকা, অভিযোগ করা থেকে জিহ্বাকে নিবৃত্ত রাখা এবং দুঃখ-দুর্দশার সময় মুখে আঘাত করা কিংবা শরীরের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা থেকে নিজের হাতকে সংযত রাখা।'[১]

সবরের বিশেষ গুণ যাদের আছে তারাই সৌভাগ্যবান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

'সবরের চাইতে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোনো জিনিস কাউকে দেওয়া হয়নি।'[২]

[১] 'সবর' শব্দের অনুবাদ এক শব্দে করা আসলে অসম্ভব। যদিও সাধারণভাবে এর অনুবাদ করা হয় 'ধৈর্য', কিন্তু সবর আসলে ধৈর্যের চেয়েও ব্যাপক অর্থ বহন করে। এর ভাবানুবাদ হয় আল্লাহর পথে অটল থাকা, দৃঢ় থাকা। পরীক্ষা যত বড়ই হোক না কেন, দৃঢ়তার সাথে প্রতিদানের আশায় আল্লাহর আদেশ পালন করে যাওয়া এবং সর্বাবস্থায় তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা—সবই সবরের অন্তর্ভুক্ত। – সম্পাদক

[২] বুখারি, আস সহীহ : ১৪৬৯

মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, যারা সবর করে তাদেরকে অজস্র সওয়াব দান করা হবে। তাদের প্রতিদান এত বেশি পরিমাণ হবে যে, তা না মাপা যাবে আর না গণনা করা যাবে। আল্লাহ বলেন,

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

“নিশ্চয় সবরকারীদেরকে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে পরিপূর্ণরূপে এবং (তা হবে) অগণিত।”[১]

উত্তমরূপে সবর এনে দেবে প্রতিশ্রুত প্রতিদান, যার ওয়াদা আল্লাহ করেছেন। আর তা অর্জন করতে হলে বিপদের শুরু থেকে সবরের অনুশীলন করতে হবে। যখন সর্বপ্রথম বিপদের ব্যাপারটি আপনি আঁচ করতে পারবেন, ঠিক তখন থেকেই সবরের অনুশীলন করতে হবে। বস্তুত, অন্তর তো দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়, কিন্তু তবুও আল্লাহর বান্দারা হতাশায় মুষড়ে পড়ে না। তারা সবর করে। আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে।

যখন বিপদ আসে তখন মানুষ বিচলিত হয়। একটা সময় পর যখন কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়, তখন সে সবর করে। কিন্তু এটি প্রকৃত সবর নয়। প্রকৃত সবর তো করতে হবে তখন, ঠিক যে মুহূর্তে আপনার ওপর বিপর্যয় আসবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الصبر عند الصدمة الأولى

‘নিশ্চয় সবর তো (করতে হবে) প্রথম আঘাতেই।’[২]

বাস্তবতা হচ্ছে প্রত্যেককেই সবর করতে হয়। ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক কিংবা অনিচ্ছায়, একসময় সবাইকেই সবর করতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি তো সে-ই, যে প্রথম থেকেই স্বেচ্ছায় সবর করে, সবরের মহান উপকারিতাগুলো বোঝে সবর করে। সে জানে তার সবরের বিনিময়ে সে পুরস্কৃত হবে। আর যদি পেরেশান হয়ে পড়ে তবে সে নিন্দিত হবে। সে জানে, যে সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে গেছে তা আর ফিরে আসবে না। সে জানে, সে আল্লাহর ফায়সালা বদলে ফেলতে পারবে না।

বোকা তো সেই ব্যক্তি যে অভিযোগ করে, যন্ত্রণা ভোগ করে। আর যখন তার কোনো উপায় থাকে না, তখন সে সবর করে। তার এই সবরে তো কোনো উপকারই

[১] সূরা আয যুমার, ৩৯ : ১০
[২] বুখারি, আস সহীহ : ১৮৭৬

নেই।

- ইহতিসাব : প্রত্যেক দুঃখ-দুর্দশার সময় আল্লাহর নিকট হতে সওয়াবের প্রত্যাশা করাকে ইহতিসাব বলে। যত বেশি কষ্ট-যাতনা হোক না কেন, আল্লাহর নিকট হতে এর বিনিময়ে ক্ষমা ও মাগফিরাত কামনা করা হচ্ছে ইহতিসাব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার মুমিন বান্দার নিকট থেকে যখন তার অতি প্রিয়জনের জান কবজ করা হয়, আর সে আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহর নিকট তার একমাত্র প্রতিদান হলো জান্নাত।"[১]

আসুন আমরা ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়ার কথা স্মরণ করি। আসিয়ার স্বামী ছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জালিম বাদশাহ ফিরআউন। এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কারণে আসিয়ার ওপর তার স্বামী ভয়াবহ অত্যাচার করত। এত মারাত্মক জখম আর যন্ত্রণা সহ্য করার পরেও আসিয়া স্বীয় বিশ্বাসে অটল থাকতেন, অসামান্য ধৈর্য আর ইহতিসাব প্রদর্শন করতেন সর্বদা।

তিনি আল্লাহর কাছেই দুআ করলেন। তিনি আল্লাহর কাছে কী চাইলেন? তিনি চাইলেন আল্লাহ যেন জান্নাতে তাকে একটি প্রাসাদ বানিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা এ অসামান্য ঘটনা কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

> "আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্যে ফিরআউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল : হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।"[২]

যখন তিনি এই দুআ করলেন, তখন আকাশের দ্বারগুলো উন্মোচিত হয়ে গেল। আর আসিয়া জান্নাতে তার ঘর দেখতে পেলেন। তা দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

ফিরআউন আদেশ করল, একটি বড় পাথরখণ্ড এনে তা যেন আসিয়ার ওপর ফেলে আসিয়াকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু সে পাথরখণ্ড আসিয়ার ওপর নিক্ষিপ্ত

---

[১] প্রাগুক্ত
[২] সূরা তাহরীম, ৬৬ : ১১

হওয়ার আগেই আসিয়ার জান কবচ করে ফেলা হলো।

ইহতিসাবের কারণে আল্লাহ আসিয়াকে দুইটি নিয়ামাত দান করলেন। তাকে জান্নাতে প্রাসাদ বানিয়ে দিলেন এবং ফিরআউনের দুষ্ট পরিকল্পনা থেকেও হিফাজত করলেন। তাইতো তার পরে কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত যারাই আসবেন, তাদের সবার জন্য তিনি দৃষ্টান্ত হয়েই থাকবেন।[১]

- **ইসতিরজা ইহতিসাব :** বিপদের সম্মুখীন হয়েও আল্লাহর প্রভুত্বের ঘোষণা দেওয়া ও আল্লাহর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেওয়াকে ইস্তিরজা বলে। ইস্তিরজা হচ্ছে বিপদসংকুল অবস্থায় 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন' বলা; অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।'

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

“এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়-ক্ষুধা-মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে : নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।”[২]

উম্মু সালামা ﵂ থেকে বর্ণিত

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيراً منها » إلا أخلف الله له خيراً منها

‘রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “ যখনই কোনো মুসলিম বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হয় আর এ কথা বলে যে : ‘নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার বিপদের জন্য আমাকে পুরস্কৃত করো আর তা আমার জন্য উত্তম কোনো জিনিস দিয়ে বদলে দাও’—তা হলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে পুরস্কৃত করবেন এবং তার (বিপদের) পরিবর্তে তাকে উত্তম

[১] তাবারি, আত তাফসীর : ২৩/৫০০
[২] সূরা বাকারা, ০২ : ১৫৫-১৫৬

জিনিস দান করবেন।"

উম্মু সালামা ﷺ বলেন, "আর তাই যখন আমার স্বামী আবূ সালামা ﷺ মারা যান, তখন আল্লাহ আমাকে এই দুআ করার তৌফিক দিলেন। আর তার (আবূ সালামা-র) পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিলেন (অর্থাৎ পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উম্মু সালামা-র বিয়ে হয়)।[১]

• **শাকওয়াহ :** শাকওয়াহ অর্থ অভিযোগ করা, নালিশ জানানো। শাকওয়াহ দুই ধরনের—

ক) প্রথম ধরনের শাকওয়াহ হলো আল্লাহর কাছে নিজের দুঃখ-কষ্ট পেশ করা। এটি সবরের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের শাকওয়াহ-র অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। ইয়াকূব ﷺ বলেছিলেন,

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّـهِ

"আমি তো আমার দুঃখ-বেদনা আল্লাহর নিকটই পেশ করি।"[২]

খ) আরেক ধরনের শাকওয়াহ হচ্ছে মানুষের নিকট নালিশ করা। এটি হতে পারে প্রত্যক্ষভাবে কথার দ্বারা অথবা পরোক্ষভাবে আচার-আচরণ বা কাজের দ্বারা, যেমন : বিবর্ণ পোশাক পরিধান করা, মাথা মুণ্ডানো, হতাশা প্রকাশ করা ইত্যাদি কাজের দ্বারা। এ-ধরনের শাকওয়াহ হচ্ছে সবরের সাথে সাংঘর্ষিক। এ-ধরনের শাকওয়াহ আল্লাহর ফায়সালার ওপর অসন্তুষ্টি ও অনাস্থা প্রকাশ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমানের দৃঢ়তার অভাব প্রমাণ করে।

তবে নিজের আপনজনকে নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানানো দোষের কিছু নয়।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর শরীরে আমার হাত বুলালাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো কঠিন জ্বরে আক্রান্ত।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, তোমাদের দু-ব্যক্তি যতটুকু জ্বরে আক্রান্ত হয়, আমি একাই ততটুকু আক্রান্ত হই।" আমি বললাম, "এটা এ-জন্য যে, আপনার জন্য প্রতিদানও দ্বিগুণ।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ!" তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

---

[১] মুসলিম, আস সহীহ : ৯১৮
[২] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮৬

ما من مسلم يصيبه أذى؛ مرض فما سواه، إلا حط الله له سيئاته، كما تحط الشجرةُ ورقَها

'যে-কোনো মুসলিমের ওপর কোনো যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি বা এ ধরনের অন্য কিছু আপতিত হলে, তাতে আল্লাহ তার গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেভাবে গাছ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে ফেলে।'[১]

সুতরাং বিপদগ্রস্ত হলে সবর করা, আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখা (ইহতিসাব), আল্লাহর কাছেই বিপদে নিজেকে সঁপে দেওয়া (ইস্তিরজা) এবং আল্লাহর কাছেই নিজের দুঃখ-দুর্দশার নালিশ জানানো। এই চারটি কাজের দ্বারা আমরা বিপদের সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দয়া অর্জন করতে পারি।

[১] বুখারি, আস সহীহ, হাদীস : ৫৭৫/১১৮

শুধু আল্লাহর কাছেই চাওয়া

কতই-না দুর্ভাগা সেসব লোক, যারা বিপদের সময় সাহায্যের আশায় কবরে আর মাজারে গিয়ে ভীড় জমায়!

হতভাগারা নিজেদের বিপদ দূর করার আকুতি জানায় নবিদের নিকট আর মৃত মানুষদের নিকট! তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّـهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝

“তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামাত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তারা তো তাদের (ভক্তদের) ডাক সম্পর্কে পুরোপুরি বেখবর।”[১]

তাদের কাজের অসারতা প্রমাণ করতে এই হাদীসটিই যথেষ্ট :

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً ؟ قَالَ : « الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ » ، قَالَ : « يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلابَةٌ زِيدَ فِي بَلائِهِ , وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ , فَلا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الأَرْضِ وَمَا لَهُ خَطِيئَةٌ ”

---

[১] সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৫

‘নবিগণ সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত হন, অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তীরা, এরপর এদের নিকটবর্তীরা। মানুষকে তার ঈমান অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। যদি তার ঈমান শক্তিশালী হয়, তা হলে তার পরীক্ষাও কঠিন হয়। আর যদি তার ঈমান দুর্বল হয়, তা হলে তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে হালকা হয়। বিপদ বান্দার পিছু ছাড়ে না, পরিশেষে তার অবস্থা এমন হয় যে, সে পাপমুক্ত হয়ে জমিনে চলাফেরা করে।’[১]

এ হাদীসটি তাওহীদের প্রমাণও বহন করে। নবিগণ সবচেয়ে বেশি পরীক্ষিত হন। তারপর তাঁদের নিকটতম স্তরের মুমিনগণ পরীক্ষিত হন। একজন সাধারণ মুসলিমের থেকে নবিগণ ও তাঁদের নিকটবর্তীগণ অনেক বেশি পরীক্ষিত হন ও কষ্ট পান। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাঁদেরকে উদ্ধার করতে পারে না। যখন কোনো সাধারণ মুসলিম এ বিষয়টি জানে, তখন সে বুঝতে পারে যে, যারা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া নিজেদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারেন না, তারা কীভাবে অপরের বিপদ হটাবেন?

কাজেই এটি তো প্রমাণিত যে, নবিগণ আর নেককারদের নিকট বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য দুআ করা বৃথা ও নিরর্থক। বরং আমাদের দুআ করা উচিত সেই মহান সত্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকটে, যিনি আমাদের বিপদ অপসারণ করতে সক্ষম।

নবি আইয়ূব ﷺ-এর ঘটনা আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাঁকে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা, প্রিয় সন্তানাদির মৃত্যু দ্বারা আর সুস্বাস্থ্য ছিনিয়ে নেওয়ার দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন।

আইয়ূব ﷺ-এর প্রচুর পরিমাণ গবাদিপশু ও শস্যাদি ছিল, ছিল সন্তানসন্ততি আর সুন্দর বাসগৃহ। এসব কিছুই তিনি হারালেন। অতঃপর তাঁকে শারীরিক অসুস্থতা দ্বারা পরীক্ষা করা হলো। মানুষজন তাঁকে পরিত্যাগ করল। তিনি শহরের একপ্রান্তে একাকী থাকতে বাধ্য হলেন। শুধুমাত্র তাঁর স্ত্রী রয়ে গিয়েছিলেন দেখভাল করার জন্য। এমন অবস্থায়ও আইয়ূব ﷺ সবরের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এত কষ্টের পরও আল্লাহর ওপর তাঁর ভরসার কোনো কমতি হয়নি।

তারপর তিনি একাকী আল্লাহর কাছেই সাহায্যের জন্য দুআ চাইলেন। আল্লাহ বলেন,

[১] তিরমিযি, আস সুনান, হাদীস : ১৪৩

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

“এবং স্মরণ করুন আইয়ূব-এর কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন : আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।”[১]

অতঃপর আল্লাহ সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। আল্লাহ বলেন,

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾

“অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম এবং তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশত আর এটা আমার বান্দাদের জন্য উপদেশস্বরূপ।”[২]

কুরআন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, মৃতরা কখনোই জীবিতদের সাহায্য করতে পারবে না। অতএব, যারা পূর্ববর্তী নেককার মৃত লোকদেরকে নিজেদের বিপদ দূরীভূত করার জন্য ডাকবে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অধিকন্তু, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকা শিরক। শিরক হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করার পাপ, সবচেয়ে ভয়াবহ অপরাধ। শিরক এজন্য হবে যে, দুআ একধরনের ইবাদাত আর ইবাদাত একমাত্র আল্লাহরই হক।[৩]

আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

“তোমাদের পালনকর্তা বলেন : তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো। যারা আমার ইবাদাতে অহংকার করে তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে

[১] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৩

[২] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৪

[৩] ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকা’ বলতে বোঝানো হয়েছে যেসব ব্যাপার কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া যায় সেগুলোর জন্য মানুষের দ্বারস্থ হওয়া। যেমন সম্পদ বৃদ্ধি, সন্তানলাভ ইত্যাদি। এগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে কামনা করা শিরক। কিন্তু সাধারণ সমস্যায় মানুষের সাহায্য চাইতে দোষ নেই, যেমন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য যাওয়া। তবে এসবক্ষেত্রেও বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহই পারেন সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে, তাঁর হুকুম না হলে কোনো সাহায্যকারীর সাহায্য কাজে আসবে না। এবং তাঁর কাছেই ক্রমাগত সাহায্য চাইতে থাকতে হবে। - সম্পাদক

প্রবেশ করবে।"[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الدعاء هو العبادة

"দুআ হচ্ছে ইবাদাত।"[২]

আল্লাহর বান্দারা যদি আল্লাহর হক আদায় করে আর শুধু আল্লাহরই ইবাদাত করে, তবে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। এটি আল্লাহর ওয়াদা।

মুআজ বিন জাবাল ؓ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "হে মুআজ! তুমি কি জানো বান্দাদের ওপর আল্লাহর হক কী?" আমি (মুআজ) বললাম, "আল্লাহ আর তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তখন রাসূল ﷺ বললেন,

فإنَّ حقَّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا

(বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে) শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা। তাঁর (আল্লাহর) সাথে কাউকে শরীক না করা।'

তারপর রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি জানো, আল্লাহর ওপর বান্দাদের হক কী?" আমি (মুআজ) বললাম, "আল্লাহ আর তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" তখন রাসূল ﷺ জবাব দিলেন,

وحقَّ العباد على الله أن لا يُعذِّب مَن لا يُشرك به شيئًا

‘(আল্লাহর নিকট বান্দার হক হচ্ছে) তিনি তাঁদেরকে শাস্তি দেবেন না (যদি তারা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করে)।"[৩]

ইবনু আব্বাস ؓ-কে নাসীহা প্রদানকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন,

يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَىْءٍ لَمْ

[১] সূরা মু'মিন, ২৩ : ৬০
[২] আবূ দাউদ, আস সুনান : ১৪৭৪
[৩] ইজমা অনুসারে

يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

‘আল্লাহর আদেশ মেনে চলো, তা হলে আল্লাহ তোমাকে পথ দেখাবেন। তুমি আল্লাহকে মেনে চলো, তা হলে আল্লাহকে সাথে পাবে। যখন তুমি দুআ করবে, একমাত্র আল্লাহকেই ডাকবে। যখন তুমি সাহায্য চাইবে, শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। জেনে রেখো, যদি সমগ্র (মানব ও জিন) জাতি তোমার উপকার করতে একত্র হয়ে যায়, তারপরেও তারা—আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন—তার বাইরে তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। আর তারা যদি সকলে তোমার ক্ষতি করার জন্য জড়ো হয়, তবুও আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন, তার বাইরে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, আর কাগজ শুকিয়ে গেছে।’[১]

আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “গুনাহের সাথে সম্পর্ক নেই কিংবা রক্ত-সম্পর্ক ছিন্নকরণের সাথে জড়িত নয় এমন দুআ যদি কোনো মুসলমান করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে তিনটি জিনিসের একটি দান করবেন : আল্লাহ হয়তো শীঘ্রই তার দুআয় সাড়া দেবেন অথবা বিচার দিবসে প্রতিদান দেওয়ার জন্য তা জমা রাখবেন অথবা এই দুআর সমপরিমাণ ক্ষতি থেকে তাকে রক্ষা করবেন।”

সাহাবিগণ তখন প্রশ্ন করলেন, “আমরা যদি একাধিক দুআ করি, তখন কী হবে?” রাসূল ﷺ জবাব দিলেন, “আল্লাহ আরও বেশি দুআ কবুলকারী।”[২]

আরেকটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর কোনো সাবধানতা অবলম্বনের দ্বারাই বদলে যায় না। আল্লাহ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন আর যা রাখেননি, উভয় অবস্থাতেই দুআ কল্যাণকর। আল্লাহ তাকদীরে যে বিপদ লিখে রেখেছেন, দুআ কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত তার মুখোমুখি হয়ে কুস্তি লড়তে থাকে।”[৩]

আল্লাহ বলেন,

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

---

[১] তিরমিযি, আস সুনান : ২৫১৮
[২] আহমাদ, আল মুসনাদ
[৩] আলবানি, সহীহ আল জামি : ৭৭৩৯

“আর আল্লাহ যদি তোমার ওপর কোন কষ্ট আরোপ করেন, তা হলে তিনি ছাড়া কেউ নেই তা খণ্ডাবার মতো। পক্ষান্তরে যদি তিনি কোনো কল্যাণ দান করেন, তবে তাঁর মেহেরবানিকে রহিত করার মতোও কেউ নেই। তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তুত তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।”[১]

[১] সূরা ইউনুস, ১০ : ১০৭

আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিছুই হয় না

আপনি হয়তো কোনো ব্যাপার নিয়ে বিচলিত, আপনার কণ্ঠ বিষাদগ্রস্ত, আপনার মনে হয়তো শান্তি নেই। তবে জেনে রাখুন :

যা আপনার ভাগ্যে নির্ধারিত আছে, তা আপনার কাছেই আসবে।

যদিও-বা আপনি আপনার বাসায় ঘুমিয়ে থাকেন।

আপনি ধৈর্য রাখুন আর দুআ করে যান।

ধৈর্য রাখুন।

আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন, তা নিয়ে অতি উল্লসিত হবেন না। আর আল্লাহ আপনাকে যা দেননি, তা নিয়ে দুঃখ করবেন না। কারণ এ সবই আল্লাহ লিখে রেখেছেন।

এখন আমরা ইসলামের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস 'তাকদীর' নিয়ে আলোচনা করব। কাদ্বা এবং কাদর নিয়ে আলোচনা করব।

কাদ্বা (القضاء) শব্দের অর্থ হচ্ছে বিচারক। কে সেই বিচারক?
আল্লাহই হচ্ছেন সেই মহাবিচারক।

কাদর (القدر) অর্থ হচ্ছে, যা আল্লাহ আপনার জন্য ফায়সালা করে রেখেছেন, যা আপনার সাথে ঘটবে—সেটিই হচ্ছে কাদর।

আপনি যখন মায়ের গর্ভে অবস্থান করছিলেন, তখন ১২০তম দিনে একজন ফেরেশতা এসে গর্ভস্থিত ফিটাসে আপনার রুহ ফুঁকে দেন। এই সময়ে আপনার ব্যাপারে চারটি বিষয় নির্ধারিত হয়ে যায় :

- আপনি জীবনে সুখী নাকি দুঃখী হবেন,
- আপনি জান্নাতি নাকি জাহান্নামি হবেন,
- আপনি জীবনে কী কী করবেন, এবং
- আপনার রিযক কোথা থেকে আসবে।
- আবার কিছু ব্যাপার বাৎসরিকভাবে নির্ধারিত হয় লাইলাতুল কাদরের রাতে, যা রমাদানের শেষ দশকের মধ্যে আছে। সেই সময় আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে যে চারটি বিষয় আগামী এক বছরের জন্যে নির্ধারণ করে দেন সেগুলো হচ্ছে :
- কারা জন্মগ্রহণ করবে,
- কারা মৃত্যুবরণ করবে,
- কোথায় কোথায় বিপদ আসবে, এবং
- কোথায় কোথায় রিযক বণ্টন করা হবে

যখন আল্লাহ কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে ফেলেছেন, তখন কেউ কি তা বদলাতে পারবে? আপনার পিতা-মাতা-ভাই-বোন-আত্মীয়-স্বজন এমনকি সারা বিশ্বের মানুষ এক হয়ে চেষ্টা করলেও তা বদলাতে পারবে না।

সুতরাং শান্ত হোন। যখন তাকদীরের ব্যাপারটি হৃদয়ে বসাতে পারবেন, তখন অন্ধকারতম পরিস্থিতির মাঝেও আশার আলোকচ্ছটার সন্ধান পাবেন। দুর্গন্ধময় দিনেও সুগন্ধের ছোঁয়া পাবেন। আপনার পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠলেও অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করতে পারবেন।

আচ্ছা, এই জিনিসগুলো আল্লাহ কখন নির্ধারণ করলেন? মনে করুন, আপনি অমুককে বিয়ে করবেন এবং আগামী দিনে আপনার পাঁচটি সন্তান হবে। এই জিনিস আল্লাহ কখন নির্ধারণ করলেন?

আসমান-জমিন সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর আগে আল্লাহ আমাদের তাকদীর নির্ধারণ করে রেখেছেন। প্রত্যেক ছোটো বড় জিনিসই নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই যা আপনার ভাগ্যে রয়েছে, সমগ্র পৃথিবী মিলে চেষ্টা করলেও তা আপনার কাছে

আসবেই। তেমনিভাবে যদি কোনো জিনিস আপনার জন্য নির্ধারণ করা না থাকে, তবে সব জাতির মানুষ একত্র হয়ে চেষ্টা করলেও তা আপনার হবে না। যতটুকু আল্লাহ ফায়সালা করেছেন, ততটুকুই আপনি পাবেন। যা আপনার তাকদীরে নেই, তা আপনার হবে না।

আপনি কি জানেন, আপনার তাকদীরে কী আছে? আপনি কি জানেন, কোনটা আপনার জন্য উত্তম?

না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। তাই আল্লাহই আপনার তাকদীর লিখে রেখেছেন। সুতরাং হতাশ হওয়ার কিছুই নেই।

আপনি এই মুহূর্তে এই লেখাটি পড়ছেন, এই বিষয়ে, এই সময়ে—এ ব্যাপারটি কিন্তু আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন।

তাকদীরের একটি স্তম্ভ হচ্ছে : আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া এই দুনিয়ায় কোনো কিছুই হয় না।

আচ্ছা, তবে কি দুনিয়ায় এমন কিছু ঘটা সম্ভব, যা আল্লাহ অপছন্দ করেন?

হ্যাঁ, সম্ভব। যদি তা আল্লাহ ঘটার অনুমতি দেন।

আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো কিছুই ঘটে না। তাই অপছন্দনীয় কিছু ঘটে গেলে বিচলিত হবেন না। রাতে অনিদ্রায় ভুগবেন না। মেজাজ খারাপ করবেন না। কারণ আপনি আল্লাহর ফায়সালার ওপর মেজাজ খারাপ করতে পারেন না। সবকিছুই আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে ঘটে।

আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ঘটনা ঘটল কিংবা আপনি কোনো জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করলেন, কিন্তু তা আপনার হলো না—এমতাবস্থায় জেনে রাখবেন যে, ওই বস্তু আদতে আপনার ছিলই না। তখন বলবেন, 'মহান আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা ছাড়া কোনো সাহায্য নেই, কোনো আশ্রয় নেই। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্যে আর আল্লাহর নিকটেই আমরা ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার দুর্ভাগ্যের বদৌলতে আমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। এবং যা পাইনি তার বদলে আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন।'

খুশি থাকুন, রাগ করবেন না। মানুষেরা তো কিছুই নয়। একবার আমি কোর্টে বিচারককে দেখে বললাম, হে আল্লাহ! সে যা-কিছুই বলে, এর সবকিছুই তো আপনি নির্ধারণ করে রেখেছেন। সে তো কিছুই না।

আল্লাহ মহাবিচারক। তিনি সবকিছু লিখে রেখেছেন। তাঁর ফায়সালা কেউ বদলাতে পারে না। আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি প্রত্যেক বস্তুর অনুপাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিস তেমনই যেমনটি আল্লাহ চেয়েছেন।

তাকদীরের একটি স্তম্ভ হচ্ছে : আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে জগতের কোনো কিছুই ঘটে না।

একদা যাইনুল আবেদীন ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "কেউ খারাপ আমল করলে আল্লাহ তার অনুমতি দেন কীভাবে? তবে কি আল্লাহ তাতে সন্তুষ্ট হোন?" যাইনুল আবেদীন ﷺ জবাব দিলেন, "আপনি আল্লাহর ওপর এটি কীভাবে আরোপ করবেন! নিঃসন্দেহে আল্লাহ খারাপ কাজ করারও অনুমতি দেন। কিন্তু তিনি তো আমাদেরকে কখনও খারাপ কাজ করার আদেশ দেননি। তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলে দিয়েছেন, কিছু কাজ আছে যা করলে তোমাকে জাহান্নামে যেতে হবে। তাই সেগুলো থেকে বেঁচে থাকো। তিনি চান না তাঁর বান্দা জাহান্নামে যাক। তিনি এটি অপছন্দ করেন, ঘৃণা করেন। এর থেকেও খারাপ ব্যাপার হলো, মানুষ আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে। আল্লাহ তো সেই কাজও সংঘটিত হওয়ার অনুমতি দেন। কারও ওপর জোর জবরদস্তি করা হয় না। কিন্তু আমরা আল্লাহর ওপর প্রভাবশালী হতে পারব না। কোনো জিনিস আল্লাহ অনুমতি দিলেই শুধু তা সংঘটিত হতে পারবে। যদি আল্লাহ কোনো জিনিসের অনুমতি না দেন, তবে তা সংঘটিত হবে না।"

একদা আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ মাসজিদে গেলেন। তাঁর সাথে একটি ঘোড়া ছিল। তিনি মাসজিদের ভেতরে প্রবেশের পূর্বে এক লোককে ঘোড়াটি দিলেন এবং বললেন, ঘোড়াটি যেন সে দেখে রাখে। লোকটি ঘোড়ার লাগাম চুরি করে নিয়ে গেল।

মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় আলি ﷺ ভাবলেন, লোকটিকে ঘোড়া দেখে রাখার জন্যে চার দিনার মজুরি দিবেন। তিনি বাইরে বের হয়ে দেখলেন ঘোড়ার লাগাম হারিয়ে গেছে। তিনি তাঁর সেবককে বললেন, "এই চার দিনার দিয়ে আমার জন্যে বাজার থেকে একটি লাগাম নিয়ে এসো।"

সেবক বাজারে গিয়ে দেখল যে এক ব্যক্তি লাগাম বিক্রি করছে। এ ছিল সেই ব্যক্তি যে লাগামটি চুরি করেছিল। সেবকটি ওই ব্যক্তির কাছে থেকেই দামাদামি করে চার দিনারে লাগাম কিনে নিয়ে এল।

একবার ভাবুন তো, লোকটি একটু অপেক্ষা করলেই বৈধভাবে চার দিনারই

পেত। কিন্তু সে তাড়াহুড়ো করল। হারাম পন্থায় চুরির মাধ্যমে একই টাকা হাতিয়ে নিল। বোঝার ব্যাপার হচ্ছে, যা আপনার ভাগ্যে আছে তা আপনারই হবে। এই চার দিনার লোকটির তাকদীরে ছিল। কিন্তু সে চুরির মাধ্যমে তা নিল। তাই আমি আপনাদের ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দেবো। যা আপনার ভাগ্যে আছে, তা আপনি ঘুমিয়ে থাকলেও আপনার কাছে আসবে। সবর করুন, আর বেশি বেশি দুআ করুন।

তিনি সব জানেন

আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

“আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে দোযখের ওপর দাঁড় করানো হবে! তারা বলবে : কতই-না ভাল হত, যদি আমরা পুনঃপ্রেরিত হতাম; তা হলে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।”[১]

আপনি কি জানেন আল্লাহ তাদেরকে জবাবে কী বলবেন?

আল্লাহ বলবেন,

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

“এবং তারা ইতঃপূর্বে যা গোপন করত, তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তারা পুনঃপ্রেরিত হয়, তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।”[২]

---

[১] সূরা আল আনআম, ০৬ : ২৭

[২] সূরা আল আনআম, ০৬ : ২৮

অর্থাৎ, আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে অবগত, তিনি সব জানেন।

হাদীসে এসেছে,

رفع القلم و جف المداد

“কলম তো তুলে নেওয়া হয়েছে আর কালিও শুকিয়ে গেছে।”[১]

অন্যভাবে বললে, আপনার সাথে যা ঘটবে, সবই লিখে রাখা হয়েছে। তাইতো আল্লাহর সিদ্ধান্তে রুষ্ট হওয়া আপনার শোভা পায় না। আপনি বলতে পারেন না, ‘আল্লাহ, তুমি আমাকে কেন এ জিনিস দিলে না?’

কারণ আপনি কী পাবেন, না পাবেন—তা আল্লাহই নির্ধারণ করে রেখেছেন, আপনি নন। আল্লাহই সেই মহান সত্তা, যিনি কবুল ও প্রদান করেন। আপনার যদি কিছু প্রয়োজন হয় তবে আল্লাহর কাছেই তা চাইবেন। এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ, কারণ সবকিছু আল্লাহর অধীনস্ত। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই কিছু করতে পারে না। তাই আমরা আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করি।

যখন আপনি কোনো কিছু চাওয়ার পরেও পাবেন না, তখন জেনে রাখবেন এই জিনিস আপনার নয়। আর যে জিনিস আপনারই নয়, তা আপনি কীভাবে নেবেন? ওই জিনিস আপনার নয়, কারণ তা হয়তো আপনার জন্যে উত্তম ছিল না।

তাই কখনও হা-হুতাশ করবেন না। কারণ আল্লাহর আদেশেই এমনটি হয়েছে। আল্লাহ মহান কিতাবে যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তা কেউ বদলাতে পারে না। আর যখন কোনো জিনিস আপনার জন্যে নির্ধারণ করে রাখা হয়, তখন তা আপনার কাছেই আসবে। ওয়াল্লাহি! আপনি তা পাবেন। আল্লাহর কসম! আপনার জন্য নির্ধারিত জিনিস কেউ আপনার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আল্লাহর কসম! তা আপনার নিকটই ফিরে আসবে।

‘ইশ’, এমন যদি হতো’, ‘আমি তো চাইতাম ওইরকম’—এ ধরনের কথা কখনোই বলবেন না। এগুলো শয়তানের তরফ থেকে আসে।

তাই নিশ্চিন্ত থাকুন এ কথা জেনে যে, আল্লাহই সবার চেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহই মানুষকে হিদায়াত দান করেন। আল্লাহ যাকে চান, তাকে দিগ্‌নির্দেশনা দান করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার জন্যে কোনো হিদায়াত নেই।

---

[১] আহমাদ, আল মুসনাদ, হাদীস : ২৬৬৯-২৭৬২; সহীহ।

আল্লাহ যা-কিছুর অনুমতি দিয়েছেন তা-ই হবে, এর ব্যতিক্রম হবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন—যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রক্ষক, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক।

সুতরাং আমরা জানলাম, তাকদীরের মূল কথা হচ্ছে :

- আল্লাহ সব জানেন।
- আল্লাহ প্রত্যেক জিনিস লিখে রেখেছেন।
- আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।
- আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মহাবিশ্বে কোনো কিছুই সংঘটিত হতে পারে না।

আপনি যখন এ বিষয়গুলো অনুধাবন করবেন, তখন তা আপনার অন্তর বদলে দেবে। আপনাকে পরিতুষ্ট করবে। আপনি দুনিয়াতে বন্দি থাকবেন কিন্তু আপনার আত্মা জান্নাতে ঘুরে বেড়াবে। আপনার ওপর সম্ভাব্য সকল বিপদ আপতিত হলেও আপনার অন্তর ও পদযুগল অবিচল থাকবে। কারণ আপনি জানেন, সবই আল্লাহর বিধান।

পৃথিবীতে তো অনেক গাছপালা আছে। প্রতিবছরই প্রচুর পরিমাণে গাছ কাটা হয়। আপনি কি এর পরিমাণ জানেন? আল্লাহ কিন্তু জানেন। শুধু পাতার কথাই চিন্তা করে আমি হতবিহ্বল হয়ে যাই। চিন্তা করুন আল্লাহর জ্ঞানের পরিধি কত ব্যাপক! আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

"তাঁরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা-কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। (গাছ থেকে) যে পাতাটি পড়ে, তাও তাঁর জানা আছে। মৃত্তিকার অন্ধকারে শস্যকণা অথবা আর্দ্র বা শুষ্ক যে বস্তুটি আছে, তাও একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।"[১]

[১] সূরা আল আনআম, ০৬ : ৫৯

দুআর শক্তি

দুআর শক্তি অতুলনীয়। ইসরাঈলি রেওয়ায়েতে দুআ নিয়ে মূসা ﷺ-এর একটি সুন্দর ঘটনা আছে। যেহেতু ঘটনাটি আমাদের ধর্মের কোনো শিক্ষার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নয়, তাই আমি ঘটনাটি বর্ণনা করছি[১]

মূসা ﷺ ছিলেন কালিমুল্লাহ, তিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলতে পারতেন। একদা এক মহিলা মূসা ﷺ-এর কাছে এসে অনুরোধ করল, যাতে তিনি আল্লাহর কাছে তার ব্যাপারে ফরিয়াদ করেন। ওই মহিলা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, মূসা ﷺ যাতে আল্লাহকে অনুরোধ করেন আর আল্লাহ তাকে সন্তান দান করেন। মহিলাটির বিবাহের পর অনেকদিন হয়ে গিয়েছিল, মনেপ্রাণে তিনি মা হতে চাচ্ছিলেন। মূসা ﷺ আল্লাহর কাছে চাইলেন। আল্লাহ জবাব দিলেন, সেই মহিলা বন্ধ্যা, সে সন্তান জন্মদানে অক্ষম। মূসা ﷺ মহিলাকে এ কথা জানালে সে চলে গেল।

আমি বা আপনি যদি আল্লাহর কাছ থেকে এ ব্যাপারে জানতে পারতাম, আমরা হয়তো থেমেই যেতাম। আমরা অনেকে তো কিছুদিন দুআ করেই হতাশ হয়ে যাই আর নালিশ জানাই। অনুযোগ করে ফেলি—আল্লাহ কখনোই আমাদের দুআ শুনেন না। কিন্তু ওই মহিলা ক্রমাগত আল্লাহর কাছে দুআ করে যাচ্ছিল। সে সকাতরে, বিনীত ও বিনম্রভাবে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকল। কখনও দুআ করা বাদ দিলো না। এরপর একদিন তিনি দ্বিতীয়বার মূসা ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, "আপনার প্রভুকে বলুন, হে মূসা!" আল্লাহ একই জবাব দিলেন।

[১] এভাবে শিক্ষা লাভ করার জন্যে ইসরাইলিয়াত থেকে ঘটনা নেওয়া যায়, যদি তা ইসলামের মূল শিক্ষার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়ে থাকে। - অনুবাদক

এভাবে তিনি তিনবার মূসা ﷺ-এর কাছে অনুরোধ জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন। এবারও একই উত্তর পেলেন—তিনি বন্ধ্যা, সন্তান জন্মদানে অক্ষম। তিনি চতুর্থবার মূসা ﷺ-এর সাথে দেখা করলেন। কিন্তু এবার তার কোলে একটি ফুটফুটে শিশু ছিল। তার হাত ধরেছিল আরেকটি শিশু। তিনি বললেন, "দেখুন মূসা! আল্লাহ আমাকে দুটো সন্তান দান করেছেন।"

মূসা ﷺ বিব্রত বোধ করলেন। আল্লাহকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহ! আপনি তিনবার আমাকে জানালেন যে, সে বন্ধ্যা, তার সন্তান হবে না। কিন্তু তারপর আপনি তাকে সন্তান দান করলেন!"

আল্লাহ জবাব দিলেন, "প্রত্যেকবার যখন আমি লিখে রাখি যে সে বন্ধ্যা, তখনই সে দুআ করছিল আর বলছিল : 'হে দয়াময়! হে দয়াময়! হে দয়াময়!' হে মূসা! আমার দয়া আমার ক্রোধকে অতিক্রম করেছে।"

তাই যখন আপনি আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইবেন, মনে রাখবেন—আল্লাহ আপনাকে তা দিতে সক্ষম। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তো কিছুই হয় না। তাই আপনার উচিত ধৈর্যের মাধ্যমে আপনার দুআকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা। আমরা কোনো কিছু ঘটলে রাগান্বিত হই না, হতাশও হই না। এর কারণ শুধু এটাই না যে, এসব তো তাকদীরে লিখে রাখা আছে। বরং এর কারণ হলো, এগুলো যে আল্লাহ-ই লিখে রেখেছেন! আল্লাহ বলেন,

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

"পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও, তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে বেশি উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।"[১]

তাই বিপদ আসলে ধৈর্য ধরুন। বিপদের সময়ে কেউ অভিযোগ করে, কেউ পশ্চাদপসরণ করে, আবার কেউ ধৈর্য ধরে। যারা ধৈর্য ধারণ করে ও আল্লাহর প্রশংসা

[১] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২২,২৩

করে তারাই সর্বোত্তম। আল্লাহ জানেন আপনার জন্যে কোনটি ভালো। আল্লাহ সব সময় আপনার জন্যে ভালো জিনিসই নির্ধারণ করবেন। সব সময়!

যা-ই ঘটুক না কেন, আপনি বলুন, "আল হামদু লিল্লাহ!"

নবিরা বলতেন, "আল হামদু লিল্লাহ আলা কুল্লি হাল!"

আপনি কি জানেন এর মানে কী?

এই দুআর মানে হচ্ছে, সব সময়, সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করা। কারণ আল্লাহ-ই তো তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অন্তর থেকে সবকিছু বের করে দেন। শুধুমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করুন। আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকুন। কখনও দুআ করা ছেড়ে দেবেন না।

ক্বাদা আর কাদরের ব্যাপারগুলো তো আমরা জানি। আমরা জানি যে, যা-কিছু আগামীতে ঘটবে, সব লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহ হচ্ছেন বিচারক, ফায়সালাদাতা। তিনি অনেক অনেক বছর আগে, পঞ্চাশ হাজার বছরেরও আগে সবকিছুর ফায়সালা করে রেখেছেন। আমরা কি আল্লাহর ফায়সালা অস্বীকার করতে পারি?

না।

তাই যা আপনার হবার নয়, তা আপনার হবে না। আর যা আপনার, তা আপনি পাবেনই।

আপনি নিজের বাসায় যান। আপনি দেখবেন বিভিন্ন স্থান থেকে আপনার খাদ্য আসে। আমরা তো এখানে (আমেরিকায়) বিভিন্ন দেশ থেকে খাদ্য পাই। আঙুর, ডুমুর-সহ প্রত্যেকটি ফলমূল আলাদা আলাদা দেশ থেকে আসছে। সুবহানাল্লাহ! আফগানিস্তান, পাকিস্তান, আফ্রিকা, কোরিয়া-সহ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে খাদ্য প্রস্তুত হয়ে আসে, যাতে তা আমরা খেতে পারি।

আপনার বাবা আজ বাসায় খাবার নিয়ে আসবেন। আপনি জানেন না, রুটি কোথা থেকে আসবে। তবুও যা আপনার জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে, তা আপনি পাবেনই, যদি তা ভিন্ন দেশ থেকে আসে তবু। আপনার জন্য নির্ধারিত অংশ আপনি পাবেন। কেউ তা আটকাতে পারবে না। কারণ তা তাকদীরে লেখা আছে। আমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্ধারিত করে রেখেছেন, তা আমরা পাব। আমরা যা পানি পান করি, খাদ্য গ্রহণ করি কিংবা যেখানে যাই—তা সবকিছু আল্লাহ লিখে রেখেছেন। এভাবে আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন বলেই তা এরকম হয়।

বেশি বেশি দুআ করুন। ইমাম আহমাদ ﷺ আর রুটিওয়ালার গল্প থেকে আমরা দুআর শক্তি বুঝতে পারি।

একদা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ﷺ শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন। রাত্রিযাপনের জন্যে তিনি একটি মাসজিদে প্রবেশ করলেন। মাসজিদের পাহারাদার বলল, অনেক রাত হয়ে গেছে, এখন মাসজিদ ছাড়তে হবে। মাসজিদ বন্ধ করার সময় হয়ে গিয়েছিল। ইমাম আহমাদ ﷺ পাহারাদারকে জানালেন যে, তাঁর আর রাত কাটানোর জায়গা নেই, তবুও পাহারাদার তাঁকে উঠে যাবার জন্য জোর করছিল।

চিন্তা করুন। ইমাম আহমাদ ﷺ ছিলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম! তিনি যদি চাইতেন, তো নিজের পরিচয় দিতে পারতেন। তিনি যা চাইতেন, তা-ই পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না, রাহিমাহুল্লাহ। তিনি তার জিনিসিপত্র নিয়ে বেরিয়ে এসে মাসজিদের সিঁড়িতে শুয়ে পড়লেন। পাহারাদার বাইরে বেরিয়ে ইমাম আহমাদ ﷺ-কে সিঁড়ি থেকে উঠে যেতে বলল। অতঃপর পাহারাদার ইমাম আহমাদ ﷺ-এর পা ধরে টেনে-হিঁচড়ে তাঁকে রাস্তার মাঝখানে ফেলে রেখে চলে গেল।

রাস্তার পাশেই এক ধার্মিক রুটিওয়ালার দোকান ছিল। সে ইমাম আহমাদ ﷺ-কে দেখে নিজের সাথে রাতে থেকে যেতে বলল। সে রাতভর রুটি বানায় তাই ইমাম আহমাদ ﷺ তার স্থানে ঘুমোতে পারবেন।

রাতে ইমাম আহমাদ ﷺ একটি অভাবনীয় দৃশ্য দেখলেন। রুটিওয়ালা রাতভর কাজ করছিল। সে ময়দা গোলে রুটির খামির বানাচ্ছিল আবার কখনও-বা রুটি সেঁকছিল। কিন্তু এসব কাজের মধ্যেও সে রাতভর আল্লাহর যিকর করে যাচ্ছিল, তাসবিহ জপছিল। ইমাম আহমাদ ﷺ তা দেখে বিস্মিত হলেন।

এই লোকটি রাতভর আল্লাহর যিকর করছিল। অথচ, আজকাল মানুষ কত তাড়াতাড়ি যিকর করে ক্লান্ত হয়ে যায়। ইমাম আহমাদ ﷺ রুটিওয়ালার কাছে জানতে চাইলেন যে, কদিন ধরে সে এই আমল করে যাচ্ছে। রুটিওয়ালা জবাব দিলো যে, সে জীবনভর এই আমল করে আসছে।

ইমাম আহমাদ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই আমলের কোনো ফল সে পেয়েছে কি না। লোকটি তখন যে জবাব দিলো, তা শুনে ইমাম আহমাদ ﷺ হতবিহ্বল হয়ে গেলেন। রুটিওয়ালা জবাব দিলো, "আমি আল্লাহর কাছে কোনো দুআ করেছি আর আল্লাহ তা কবুল করেননি, এমন কখনও হয়নি, শুধুমাত্র একটি দুআ বাদে।" ইমাম আহমাদ ﷺ তখন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কোন দুআটি কবুল হয়নি?"

রুটিওয়ালা জবাব দিলো যে, সে আল্লাহর কাছে দুআ করত যেন ইমাম আহমাদের সাথে তার দেখা হয়। কিন্তু সেই দুআটি এখনও কবুল হয়নি।

এ কথা শুনে ইমাম আহমাদ কেঁদে ফেললেন। তিনি রুটিওয়ালাকে বললেন, "সুবহানাল্লাহ! তিনিই তো হচ্ছেন আল্লাহ... তিনি আমাকে টেনে-হিঁচড়ে তোমার দোকানে এনে ফেলেছেন, যেন আল্লাহ আমাকে দিয়ে তোমার দুআ কবুল করাতে পারেন।"

দেখতেই পারছেন আল্লাহর যিকর-করার ফযীলত!

দুআ ওপরের দিকে উঠতে থাকে, বিপদ নিচের দিকে নামতে থাকে এবং মাঝপথে তারা একে অন্যের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এ লড়াইয়ে বিজয় নির্ভর করে কে বেশি শক্তিশালী তার ওপর। ইখলাস ও কবুলিয়াতের আশা নিয়ে করা দুআ বিপদের ওপর প্রবল হয়, বিজয় লাভ করে এবং তখন বিপদ আর সংঘটিত হতে পারে না।

পক্ষান্তরে অমনোযোগের সাথে, হতাশা নিয়ে করা দুআ থেকে বিপদ শক্তিশালী হয়। তখন বিপদ দুআকে পরাজিত করে নিচে নেমে আসে।

কখনও কখনও তারা সমানে সমান হয় আর কিয়ামাত পর্যন্ত একে অন্যের সাথে লড়তে থাকে। সুতরাং,

- দুআ শক্তিশালী হলে তা বিপদকে পরাজিত করবে এবং আটকে দেবে।
- বিপদ দুআ থেকে শক্তিশালী হলে তা দুআর ওপর বিজয়ী হবে এবং নিচে নেমে আসবে।
- যদি তারা সমানে সমান হয়, তবে তারা কিয়ামাতের আগ পর্যন্ত পরস্পর লড়াই করতে থাকবে।

তাই আমাদের সব সময় দুআ করা উচিত, যাতে দুআ শক্তিশালী হয়ে যায়। আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করবেনই এমন দৃঢ় সংকল্পের সাথে দুআ করুন এবং ফলাফলের ব্যাপারে উত্তম প্রত্যাশা রাখুন। আল্লাহ তাঁর নিজের ব্যাপারে বলেন, যে এই ধারণা রাখে যে আমি ক্ষমাশীল, তাকে আমি অবশ্যই ক্ষমা করে দেবো। আমার বান্দা আমার ব্যাপারে যেমন ধারণা রাখে, আমি তেমনই। অন্যভাবে বললে, আল্লাহর কাছে আপনি যা চান তা তাঁর কাছে থেকেই চেয়ে নিন দুআর মাধ্যমে।

উমার ﵁ বলেন, "আল্লাহ আমার দুআর কী জবাব দেবেন সে ব্যাপারে আমি চিন্তিত নই। আমি তো চিন্তিত থাকি কীভাবে আমি আমার দুআকে সাজাতে এবং

আল্লাহর কাছে চাইতে পারি। কারণ আমি যখন দুআ করব, আল্লাহ তো উত্তর দেবেনই।" উমার নিঃসংশয় ছিলেন যে তাঁর দুআ কবুল হবেই, রাদিয়াল্লাহু আনহু।

সুখানুভূতির শুরু এখানেই

জীবনকে আরামদায়ক ও সমৃদ্ধ করার উপকরণ ইতিহাসের কোনো যুগেই বর্তমান সময়ের মতো এতটা হাতের নাগালে ছিল না। মহাবিশ্বের জটিল সব রহস্য উন্মোচন কিংবা প্রতিকূল প্রকৃতিকে বশ করার এত উপায় এ যুগের মতো এত ব্যাপকভাবে মানুষ আগে আয়ত্ত করেনি।

অনলাইন শপিং থেকে শুরু করে চোখের লেজার অপারেশান, বিদ্যুতের সর্বময় ব্যবহার বা ঘর উষ্ণ রাখার যন্ত্র—জীবনকে আরামদায়ক করার সামগ্রীর এ তালিকা যেন শেষ হবার নয়। এত এত অসাধারণ অর্জনের পরেও সুখী জীবনের স্বপ্ন যেন আজ আরও অধরা হয়ে গেছে।

২০১৬ সালে দ্য গার্ডিয়ান ম্যাগাজিনের প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইংল্যান্ডে ২০১৫ সালে প্রায় ৬১ মিলিয়ন (৬ কোটিরও অধিক) হতাশাদূরীকরণের ওষুধ চিকিৎসকেরা হাসপাতালগুলোর বাইরে ব্যবহারের জন্য প্রদান করেছেন। অফিসিয়াল তথ্যানুযায়ী ইংল্যান্ডে গত এক দশকে হতাশাগ্রস্ত রোগীদের এই ওষুধ দেওয়ার পরিমাণ দ্বিগুণে উন্নীত হয়েছে।

নিউজিল্যান্ডের নাম শুনলেই মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্য আর বিশাল বিস্তৃত পাহাড়ের সৌন্দর্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অথচ বেশ ক-বছর ধরেই দেশটিতে হতাশা আর আত্মহত্যার হার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনিসেফের একটি পরিসংখ্যান দেখলে চমকে উঠতে হয়—উন্নত দেশগুলোর মধ্যে নিউজিল্যান্ডেই তরুণদের আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি।

একবিংশ শতাব্দী আমাদের পাখির মতো আকাশে উড়তে শিখিয়েছে, শিখিয়েছে মাছের মতো সাগরে সাঁতার কাটতে। কিন্তু শেখায়নি পরিতুষ্ট এক স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে পৃথিবীতে বিচরণ করতে। এখনও মানুষ তার সমস্যাগুলোর উৎস খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয় প্রতিনিয়ত।

এবার চলুন দেখে আসা যাক একজন মুসলিমের জীবনচিত্র। জীবনধারণের ক্ষেত্রে তার রয়েছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, যা তাকে সর্বদাই রাখে হাস্যোজ্জ্বল।

- একজন মুসলিমের হৃদয় অর্থ-সংকটে থাকা অবস্থায়ও প্রসন্ন থাকে কুরআনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে :

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦﴾

“আর পৃথিবীতে কোনো বিচরণশীল জীব নেই, যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার ওপর নেই। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং (মৃত্যুর পর) কোথায় তাকে সোপর্দ করা হবে। সবকিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে।”[১]

- যখন কেউ তাকে অপদস্থ করতে চায়, তখন সে এটা ভেবে প্রফুল্ল থাকে যে :

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

“সম্মান তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের জন্যই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।”[২]

- যখন বিপদের সম্মুখীন হয় তখনও সে নিশ্চিন্ত থাকে, কারণ সে জানে কুরআনের সেই অমোঘ বাণী :

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

“আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?”[৩]

---

[১] সূরা হূদ, ১১ : ৬
[২] সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৮
[৩] সূরা যুমার, ৩৯ : ৩৬

- যখন কেউই তাকে বুঝতে চায় না, তার সমস্যাগুলো শুনতে চায় না তখনও সে প্রশান্ত থাকে এ কারণে যে :

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি।”[১]

- যখন কোনো দুর্দশা দরজায় কড়া নাড়ে, সে এটা ভেবে আনন্দ অনুভব করে যে :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।”[২]

এটা হচ্ছে ইসলাম প্রদত্ত সেই আত্মিক প্রশান্তি, যা সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন,

‘মুমিনের প্রত্যেকটি বিষয়ই কল্যাণকর। যখন প্রফুল্ল থাকে, তখন সে কৃতজ্ঞতা আদায় করে এবং এটা তার জন্য কল্যাণকর। আর যখন কষ্টে থাকে, তখন সে ধৈর্যধারণ করে এবং এটা তার জন্য কল্যাণকর।’[৩]

তাই যখন কেউ আপনার কাছে সংক্ষেপে মুসলিমদের সুখময় জীবন সম্পর্কে জানতে চায়, তাকে বলুন : সুখের সময় সে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে আর কষ্টের সময় সে ধৈর্যধারণ করে। অবশেষে তাকে পৌঁছে দেওয়া হয় জান্নাতের উদ্যানে।

এরকমই হচ্ছে একজন মুসলিমের সুখী সুন্দর জীবন, যা সম্বন্ধে আমরা সকলকে অবহিত করতে চাই। একজন বিশ্বাসী জীবনের সর্বক্ষেত্রেই জান্নাতি-সুখ অনুভব করে, কারণ সে আল্লাহর প্রতিটি সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে। তাকদীরে বিশ্বাস ব্যতীত কখনোই সুখ অর্জিত হবে না, কারণ এটাই যে সুখের ভিত্তি।

রাসূল ﷺ কোন পরিস্থিতিতে কী বলতে হবে, সেটাও আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন।

- যখন একজন মুসলিম সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন তাকে বলতে শেখানো হয়েছে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন এবং

[১] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮৬
[২] সূরা আশ শারহ, ৯৪ : ৫
[৩] মুসলিম, আস সহীহ : ২৯৯৯

তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।'[১]

- যখন সে রাতে ঘুমাতে যায় তখন বলে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ

‘ সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের খাদ্য ও পানীয় দান করেছেন এবং আমাদের দায়িত্ব বহন করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন। অথচ অনেকে আছে যাদের জন্য কোনো দায়িত্ব বহনকারী নেই, আশ্রয়দাতাও নেই।'[২]

- যখন কোনো মুসলিম নতুন কাপড় পরিধান করে সে বলে :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ،

‘ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই পোশাক দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন।'[৩]

- যখন কোনো মুসলিম শৌচাগার থেকে বের হয়, সে বলে :

‘ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমার থেকে কষ্টকে দূর করেছেন এবং আমাকে স্বস্তি দিয়েছেন।'[৪]

- যখন কোনো মুসলিম তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি অর্জন করে, তখন তাকে কী বলতে শেখানো হয়েছে? সে বলে :

‘ সকল প্রশংসা এবং শুকরিয়া আল্লাহর জন্য যার অনুগ্রহে সকল ভালো জিনিস অর্জিত হয়।'[৫]

- আর যখন কোনো মুসলিম তার আরাধ্য বস্তু লাভে ব্যর্থ হয়, তখন তাকে বলতে শেখানো হয়েছে :

‘ সর্বাবস্থায় অবস্থায় আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা।'[৬]

আর তাই মুসলিমরা যে-কোনো পরিস্থিতিতে কৃতজ্ঞতার এক স্তর থেকে

---

[১] মুসলিম, আস সহীহ : ২০৮৪

[২] মুসলিম, আস সহীহ : ২০৮৩

[৩] আবূ দাউদ, আস সুনান : ৪০২০

[৪] ইবনু আবী শায়বা, আল মুসান্নাফ

[৫] নাবাবি, আল আযকার

[৬] নাবাবি, আল আযকার

অন্য স্তরে উন্নীত হয়, খুঁজে পায় পরিতুষ্টির বিভিন্নরূপ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এরূপ মানসিকতা না থাকলে কষ্টগুলো অসহ্য মনে হয়, দুর্দশাগুলো অসহনীয় রূপ ধারণ করে। জীবন যেন হয়ে উঠে সেই লবণাক্ত পানি গ্রহণকারী ব্যক্তির মতো, যার তৃষ্ণা কখনোই নিবারণ করা যায় না।

এ ধরনের মানুষগুলো দীর্ঘমেয়াদী শান্তির খুঁজে বেপরোয়াভাবে নিজেকে পাপের এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায়, এক বিছানা থেকে আরেক বিছানায়, এক পানীয় থেকে অন্য পানীয়তে, এক সম্পর্ক থেকে অন্য সম্পর্কতে, অনলাইনের একটা অশ্লীল ভিডিও থেকে অন্যটিতে আবর্তিত হয়।

কিন্তু আল্লাহর সাথে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান দূরত্ব তার অন্তরকে ধীরে ধীরে কঠিন থেকে কঠিনতর করে এবং জীবনকে করে তোলে তমসাচ্ছন্ন। সে তার অন্তরের শূন্যতা পূরণ করতে চায় যে-কোনো মূল্যে। কিন্তু তার অনুসৃত পন্থায় সেই শূন্যতা যে কখনোই পূরণ হবার নয়।

ইমাম ইবনু কায়্যিম ﵀ বলেন,

> “প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরেই কিছু অস্থিরতা বিদ্যমান যা শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই নির্মূল করা সম্ভব। প্রত্যেকের অন্তরেই একাকীত্বের অনুভূতি বিদ্যমান যা শুধুমাত্র আল্লাহর নৈকট্যলাভেই দূর করা সম্ভব। প্রতিটা অন্তরে ভয় এবং উদ্বেগ বিদ্যমান যা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে ছুটে যাওয়ার মাধ্যমেই কাটানো সম্ভব। আর অন্তরে কিছুটা দুঃখানুভূতি বিদ্যমান যা কেবলমাত্র আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমেই অপসারণ করা সম্ভব।”[১]

হারাম পন্থায় অন্তরের শূন্যতা পূরণ কখনোই সম্ভব নয়, বরং সেটা কেবল শূন্যতাকে বিস্তৃতই করে। নিচের উদাহরণটা অনুধাবন করুন :

- দুজনের মধ্যে কে বেশি সুখী?

সে-ই কি, যে কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই বছরের যে-কোনো সময় নিজের পছন্দমতো ব্যয়বহুল খাবার দিয়ে উদরপূর্তি করে?

না কি সে বেশি সুখী, যে রমাদান, অথবা একটা সোমবার কিংবা বৃহস্পতিবার ধৈর্য ধারণ করে সূর্য ডোবা অবধি সিয়াম পালন করার পর একটি খেজুর মুখে পুরে, যা তাকে অবর্ণনীয় আনন্দে উদ্বেল করে তোলে, কারণ সে অনুভব করতে পারে, সে আখিরাতের জন্য কিছু বিনিয়োগ করে আল্লাহর নৈকট্যের দিকে এক ধাপ এগিয়েছে।

[১] ইবনু কায়্যিম, মাদারিজুস সালিকীন, ৩/১৫৬

- দুজনের মধ্যে কে বেশি সুখী?

যখন কেউ যে-কোনো মূল্যে অর্থ উপার্জন করতে যায়, তখন সে আল্লাহর আনুকূল্য হারিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন কাটায়। নিদ্রাহীন রজনীযাপন তার নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়। সে জানে তার হারাম আয় থেকে করা সদাকায় আল্লাহর কোনোই আগ্রহ নেই, সে কি বেশি সুখী?

নাকি সে, যে স্বল্প হলেও হালাল উপার্জনে আত্মনিয়োগ করে, যার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে এটা ভেবে যে, সে নিজের এবং পরিবারের মানুষগুলোর মুখে জাহান্নামের আগুন নয় বরং হালাল আহার্য পুরে দিচ্ছে?

সে কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের আশায় দান করে। কোনো এতিমের ভরণপোষণ করার মাধ্যমে সে এক অপার্থিব আনন্দ অনুভব করে। সে এতিম যখন তাকে বলে, "আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক, আপনি আমার বাবার মতো।"

এই সুখানুভূতি কোনো কবির কাব্যই ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম নয়।

- দুজনের মধ্যে কে বেশি সুখী?

যে ক্ষণস্থায়ী সুখের মোহে রাতের আঁধারে একটার-পর-একটা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, সে কি বেশি সুখী?

এর ফলে তো তার অন্তরে দীর্ঘমেয়াদী অনুশোচনাবোধের জন্ম নেয়, কারণ সে জানে এই সম্পর্ক আল্লাহর কাছে কতটা হীন!

সে সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকে এটা ভেবে যে, কেউ তাদের অন্তরঙ্গতার সময় দরজায় করাঘাত করছে কি না; তার বিবেকের দংশন তাকে আতংকিত করে তোলে; মেয়েটা কি তবে গর্ভবতী হয়ে যাবে, গর্ভপাতই কি করাতে হবে... পরিস্থিতির অবনতি ঘটার সাথে সাথে তার উদ্বেগ বাড়তেই থাকে। এ ধরণের মানুষগুলো কী করে সুখী হতে পারে!

নাকি সুখী সেই ধৈর্যশীল ব্যক্তিটি, যে তার জন্য নির্দিষ্ট করা জীবনসাথি আসার আগ পর্যন্ত আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে?

তারা তো একত্র হয় বিয়ের মাধ্যমে; দাওয়াত, উপহার, সামাজিক স্বীকৃতি, আলিঙ্গন, দুআ এবং অন্তরঙ্গতা উপভোগ করে, যা তাদেরকে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। গর্ভধারণের আনন্দ, আকীকার ভোজ ইত্যাকার অনুষঙ্গগুলো তাদের প্রশান্তি আর সুখ বর্ধিত করতে থাকে।

এই দুজনের মধ্যে তবে কে বেশি সুখী?

এই অনুভূতিগুলো কিছু গভীর উপলব্ধির জন্ম দেয়। আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, মনের এই প্রশান্তি কেবলমাত্র আল্লাহর নৈকট্য আর তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আর এটা সহজেই অনুমেয় যেহেতু আল্লাহ বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“যে মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করবে—হোক সে পুরুষ কিংবা নারী—আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। এবং তারা যা করত, তার তুলনায় অবশ্যই আমি উত্তম প্রতিদান দেবো।”[১]

এবং আল্লাহ আরও বলেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

“যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামাতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।”[২]

আমরা প্রায় সবগুলো মূলধারার তত্ত্ব পড়ে ফেলতে পারি, তাক থেকে প্রত্যেকটা ওষুধ সেবন করতে পারি এবং প্রত্যেকটা দরজায় সুখের খোঁজে ধরনা দিতে পারি, কিন্তু সেই সুখের চাবিকাঠি স্রষ্টার শিখিয়ে দেওয়া জায়গাটি ছাড়া কোথাও খোঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহই বলেন,

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾

“এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান।”[৩]

আমরা সুখী, কারণ আমরা আল্লাহকে জানি, তাঁকে আমাদের রব হিসেবে পেয়ে

---

[১] সূরা নাহল, ১৬ : ৯৭
[২] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ১২৩-১২৪
[৩] সূরা আন নাজম, ৫৩ : ৪৩

আমরা সন্তুষ্ট। আমরা সুখী, কারণ আমাদের মানুষের তৈরি করা জীবনবিধানের ওপর নির্ভরশীল করা হয়নি, বরং কুরআনই আমাদের জীবনবিধান। আমরা সুখী, কারণ শেষ বিচারের দিন সর্বপ্রথম আমাদেরই হিসাব নেওয়া হবে এবং আমাদেরকেই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

বিষণ্ণতার ১৫টি প্রতিষেধক

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই বলার মতো কিছু-না-কিছু বিষাদমাখা গল্প থাকে। সে চোর হোক অথবা চুরির শিকার হোক, বিশ্বাসঘাতক হোক কিংবা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার, বিবাহিত অথবা অবিবাহিত, ধনী অথবা গরীব, স্বাস্থ্যবান অথবা দুর্বল। পৃথিবীর কোনো একজন মানুষের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে না।

এই বিষণ্ণতাবোধের মোকাবিলা যথাযথভাবে না করা হল, তা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। কারণ বিষণ্ণতা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, শরীরকে দুর্বল করে দেয়, মানুষকে সংকল্পচ্যুত করে ছাড়ে। পরন্তু অনেক মানুষকেই এটা বিরামহীন ক্রন্দন আর সীমাহীন উদ্বেগের কুচক্রে আটকে দেয়। ইমাম ইবনু কায়্যিম ﷺ বলেন,

> “বিষণ্ণতাকে কুরআনে শুধুমাত্র নিষেধাজ্ঞা প্রকাশেই উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন : ‘হতাশ হোয়ো না’, অথবা নাকচ করা অর্থে; যেমন : ‘তাদের কোনো দুঃখ থাকবে না’। এরকমটা করার নিগূঢ় রহস্য হলো, বিষণ্ণতা মানুষের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং কোনো প্রকার আত্মিক কল্যাণও সাধন করে না। মানুষকে বিষণ্ণ করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভের অগ্রযাত্রাকে বিঘ্ন ঘটানো এবং তাদের কল্যাণের কাজে বাধা দেওয়ার থেকে কোনো কিছুই শয়তানের নিকট অধিকতর প্রিয় নয়।”[১]

আমি এখানে বিষণ্ণতা থেকে পরিত্রাণের জন্য ১৫টি পরামর্শ রাখব। আল্লাহ যেন এই প্রচেষ্টাকে বিপদগ্রস্ত কিংবা ভগ্নহৃদয় ব্যক্তিদের জন্য স্বস্তির কারণ আর মুসিবত

---

[১] ইবনু কায়্যিম, মাদারিজুস সালিকিন

মোকাবিলার উপায় বানিয়ে দেন এবং বিষণ্ণতার মোকাবিলায় করা আমাদের সবার নিজ নিজ লড়াইকে জয়লাভের মাধ্যম বানিয়ে দেন।

প্রথম প্রতিষেধক : কখনোই ভুলে যাবেন না যে, আপনার এই বিপদ স্বয়ং আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়েছে। আর সত্যিকার অর্থে উবুদিয়্যাহ (আল্লাহর একজন দাস হওয়া) বলতে তিনি আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, সেটা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়াকেই বোঝায়। আল্লাহ বলেন,

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোনো বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।”[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলকামা ﵀ বলেন, “এই আয়াতটা এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যে নাকি কোনো বিপদে পতিত হয়, কিন্তু অনুধাবন করে যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, এরপর সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর সিদ্ধান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করে।”[২]

দ্বিতীয় প্রতিষেধক : মনে রাখবেন, এই কঠিন পরিস্থিতি আপনার জন্য পছন্দ করেছেন সেই পরম করুণাময় সত্তা, যিনি আপনার মায়ের থেকেও বেশি আপনার প্রতি যত্নশীল। তিনি সেই মহাজ্ঞানী সত্তা, যিনি আপনাকে কল্পনাতীত উপায়ে সাহায্য করতে চান। নবিগণ এটা অনুধাবন করতে পারতেন, তাই আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে :

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

“এবং স্মরণ করুন আইয়ূবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন : আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।”[৩]

চিন্তা করুন নবি ইয়াকূব ﵇-এর কথা, যিনি তার ছেলে হারিয়ে বলেছিলেন,

[১] সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ১১
[২] তাবারি, আত তাফসীর
[৩] সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৮৩

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾

“অতএব আল্লাহ উত্তম হিফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।”[১]

তাঁর ব্যাপারে স্মরণ করুন যিনি আপনাকে পরীক্ষা করছেন। তিনিই আমাদের রব, পরম করুণাময় ও মহাজ্ঞানী সত্তা, যিনি আপনাকে বিধ্বস্ত বা ধ্বংস করতে চান না। বরং তিনি আপনার নিজের থেকেও বেশি আপনার কল্যাণ কামনা করেন।

তৃতীয় প্রতিষেধক : অনুধাবন করুন যে, এই জটিল পরিস্থিতি আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করে প্রতিষেধক ওষুধরূপে পাঠিয়েছেন। ওষুধের প্রকৃতিই হচ্ছে তেতো; তাই এটাকে গ্রহণ করুন এবং আল্লাহর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ কিংবা অধৈর্য হওয়া থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় এই ওষুধ তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে।

ইমাম ইবনু কায়্যিম ﷺ বলেন,

“যখনই আল্লাহ কারও কল্যান চান, তিনি প্রতিষেধকস্বরূপ তাকে দুঃখ-দুর্দশায় পতিত করেন, যা তাকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য দান করতে থাকে—যতক্ষণ না সে পরিপূর্ণভাবে পরিশোধিত এবং পরিমার্জিত হয়ে যায়। আর এভাবে তিনি তাকে দুনিয়ায় উঁচু মর্যাদায় আসীন করেন; সে আল্লাহর উপাসনা করে এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিদানে তাকে ভূষিত করা হয়; সর্বোপরি, আল্লাহর দর্শন এবং নৈকট্য লাভে সে ধন্য হয়।”[২]

প্রায়শই কোনো উদ্ধত, অহংকারী পাপী চলার পথে এমন বিপদের সম্মুখীন হয়, যা তাকে গ্রাস করে নেয় এবং তার গতি থামিয়ে দেয়। এরপর সে বিনম্র হয়ে যায় এবং সালাত আদায়কারী, কুরআন অধ্যয়নকারী, দুআ প্রার্থনাকারী এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে অহংকার ত্যাগ করে।

এভাবে প্রতিষেধকরূপী দুর্দশা আপনাকে এমন রোগের আরোগ্য দেয়, যা আপনি দেখতে পান না অথচ সেটা নিরাময়ের সত্যিই প্রয়োজন ছিল।

চতুর্থ প্রতিষেধক : মনে রাখবেন, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তরাই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হন। রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো : কাদেরকে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা করা হয়?

---

[১] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৬৪

[২] ইবনু কায়্যিম, আত-তিব্ব আন-নববি

তিনি বললেন,

اَلْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِيْنِهِ فَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِه صَلَابَةٌ زِيْدَ فِيْ بَلَاءِهِ وَإِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَتْ عَنْهُ وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ فِيْ الْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ فِيْ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ

‘নবিগণ, তারপর ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, তারপর তাদের অনুরূপ লোকজন, অতঃপর তাদের অনুরূপ লোকজন। মানুষকে তার দ্বীন অনুপাতে পরীক্ষার মুখোমুখি করা হয়—তার দ্বীন পালনে দৃঢ়তা থাকলে তার বিপদ-মুসিবত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, আর দ্বীন পালনে নমনীয়তা থাকলে তার বিপদ-মুসিবত হালকা করে দেওয়া হয়। বান্দা যতদিন দুনিয়ায় বিচরণ করে, ততদিন তার পরীক্ষা চলতে থাকে, যতক্ষণ না সে পাপমুক্ত হচ্ছে।’[১]

আর এ কারণেই আমাদের পূর্বসূরিরা বলতেন, যাকে কোনো বিপদে পতিত করা হয়েছে, তাকে নবিগণের পথেই অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

পঞ্চম প্রতিষেধক : আল্লাহ যে আপনার ভালো চান, আপনার কঠিন পারিপার্শ্বিকতাই এর একটা প্রমাণ। রাসূল ﷺ বলেন,

‘আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন দুনিয়ায় তার দুঃখ-কষ্ট বাড়িয়ে দেন। কিন্তু যখন তিনি কারও জন্য অন্যথা চান, তখন তিনি তার দুর্ভোগ উঠিয়ে নেন, যাতে বিচার দিবসে দুর্ভোগের বোঝা পুরোপুরি তার ওপর চাপিয়ে দিতে পারেন।’[২]

ফুযাইল ইবনু ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেন,

‘মানুষ যেমন কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে তার পরিবারের তত্ত্বাবধান করে, ঠিক একইভাবে আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাকে পরীক্ষার মাধ্যমে তত্ত্বাবধান করেন।”[৩]

তিনি আরও বলেন,

‘ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ সত্যিকার ঈমান অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ সে দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষাকে আশীর্বাদস্বরূপ এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে দুর্ভাগ্য হিসেবে না দেখবে।”[৪]

[১] আহমাদ, কিতাব আয যুহদ, (রাসূলের চোখে দুনিয়া) : ২৩৯
[২] তিরমিযি, আস সুনান
[৩] গাজালি, ইহয়াউ উলুম আদ্দীন
[৪] আবূ নুআইন, হায়াতুল আউলিয়া

ষষ্ঠ প্রতিষেধক : অনুধাবন করা যে, আল্লাহ হয়তো জান্নাতে আপনার জন্য একটা মর্যাদাপূর্ণ স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। কিন্তু আপনার নেক আমল সেই স্থানে অধিষ্ঠান করানোর জন্য যথেষ্ট নয়। আর তাই তিনি আপনাকে কষ্টে পতিত করার মাধ্যমে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করে সেই মাকাম অর্জনে সাহায্য করেন।
রাসূল ﷺ বলেন,

‘জান্নাতে একটা নির্দিষ্ট মর্যাদা অর্জনের যথেষ্ট ভালো আমল না থাকা স্বত্ত্বেও আল্লাহ যখন কোনো বান্দার জন্য তা নির্ধারিত করে দেন, তখন তিনি তাকে শরীর, সম্পদ এবং সন্তানসন্ততি দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন। তদুপরি তাকে ধৈর্য ধারণে উৎসাহ দেন এবং এভাবে জান্নাতের সেই নির্ধারিত মর্যাদায় তাকে পৌঁছে দেন, যা তিনি তার জন্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।’[১]

আপনি যখন অনুধাবন করতে পারবেন যে, এই উদ্বিগ্নতা কিংবা কঠিন পরিস্থিতি আখিরাতে আপনার উঁচু মর্যাদা অর্জনের সোপানস্বরূপ, তখন এগুলোর মোকাবিলা করা আপনার জন্য অনেকাংশেই সহজ হয়ে যাবে।

সপ্তম প্রতিষেধক : মনে রাখবেন, দুনিয়া এবং আখিরাতে আপনার সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে আপনার কৃত পাপসমূহ। আর এহেন কঠিন পরিস্থিতি সেই পাপসমূহকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে দেয়। রাসূল ﷺ বলেন,

‘কোনো মুমিন কখনোই এমন কোন দুর্দশা, উদ্বিগ্নতা, দুঃখবোধ কিংবা দুশ্চিন্তা দ্বারা আক্রান্ত হয় না, যার মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ না করেন।’[২]

রাসূল ﷺ বলেন,

‘যখন কোনো ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়, আল্লাহ তার নিকট দুজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং তাদের বলে দেন, ‘লোকটি তাকে দেখতে আসা লোকদের কী বলে শোনো।’ যদি সে তাদের নিকট আল্লাহর প্রশংসা ব্যক্ত করে এবং তাঁর ব্যাপারে ভালো কথা বলে, ফেরেশতারা তাঁকে সে কথা জানিয়ে দেন যদিও তিনি এ ব্যাপারে তাদের থেকে বেশি অবগত। তখন আল্লাহ বলেন, ‘সুতরাং আমার বান্দার নিকট আমার পক্ষ থেকে একটি ওয়াদা এই যে, সে যদি মারা যায় আমি তাকে জান্নাতে দাখিল করব। আর যদি আমি তাকে সুস্থ করে দিই তবে তার গোশতকে উত্তম গোশত দ্বারা, রক্তকে উত্তম রক্ত দ্বারা প্রতিস্থাপন

---

[১] আবূ দাউদ, আস সুনান
[২] বুখারি, আস সহীহ ; মুসলিম, আস সহীহ

'করে দেবো এবং তার গুনাহসমূহ মুছে দেবো।'[১]

এমনকি আমাদের পূর্বসূরিরা একে অপরকে অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের পর অভিনন্দন জানাতেন। মুসলিম বিন ইয়াসার ﷺ বলেন, "তাঁরা একজন আরেকজনকে রোগমুক্তির পর বলতেন—পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য অভিনন্দন!"

এই কাঠিন্যগুলো শুধু আমাদের পাপের বোঝাই হালকা করে না বরং আমাদের পুণ্যের পাল্লাও ভারি করে। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

'যখন আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করা মানুষগুলো দুনিয়ার জীবনে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় কাটিয়ে দেওয়া মানুষগুলোকে আল্লাহপ্রদত্ত পুরস্কার দেখতে পাবে, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে—যদি তাদের চামড়াকে কাঁচি দ্বারা চাঁছা হত।'[২]

আর এ কারণেই আমাদের কতিপয় সালাফরা বলতেন, "যদি দুর্ভোগ না থাকত, তবে আমরা আল্লাহর কাছে রিক্তহস্তে মিলিত হতাম।"[৩]

ইমাম ইবনু কায়্যিম ﷺ-এর বর্ণনানুযায়ী, একজন আবেদ মহিলা একটি দুর্ঘটনায় তার একটি আঙুল হারায়। অথচ তখনও সে মুচকি হাসছিল। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, "তুমি তোমার আঙুল হারানো সত্ত্বেও হাসছ?"

সে জবাবে বলল, "এই ব্যথার বিনিময়ে প্রাপ্ত পুরস্কারের মিষ্টতা আমাকে ব্যথার তিক্ততা ভুলিয়ে দিয়েছে।"[৪]

ইমাম ইবনু কুদামা ﷺ বলেন, "যদি কোনো বাদশাহ কোনো গরিব লোককে বলে, 'প্রতিবার এই ছোটো ডাল দিয়ে আঘাত করার বিনিময়ে আমি তোমাকে ১০০০ দিনার দেবো', তো সেই গরিব মানুষটা বারংবার আঘাত পেতে চাইবে। এটা এ কারণে না যে, সে ব্যথা পাবে না। বরং এ কারণে যে, সে তার কাঙ্ক্ষিত বিনিময় পাবে যদি আঘাতগুলো কষ্টদায়ক হয় তবু।"[৫]

অষ্টম প্রতিষেধক : মনে রাখবেন, যা আপনার ওপর আপতিত হয়েছে, তা হয়তো

[১] আল-মুনযিরি, তারগীব
[২] তিরমিযি, আস সুনান
[৩] ইবনু জাওযি, সিফাতুস সাফওয়া
[৪] ইবনু কায়্যিম, মাদারিজুস সালিকিন
[৫] ইবনু কুদামা, মিনহাজুল কাসিদীন

আপনার কৃত গুনাহের জন্যই। আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۝٣٠

"তোমাদের ওপর যেসব বিপদআপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল।"[১]

তাই আফসোস করে সময় ব্যয় না করে, সেই প্রচেষ্টাটুকু তাওবাতে প্রয়োগ করুন। কারণ এটা দুঃখদুর্দশা লাঘবের একটি অন্যতম উপায়।

আলি ﵁ বলেন, "প্রত্যেকটা বিপদের কারণ হচ্ছে গুনাহ এবং তাওবা ব্যতীত সেই বিপদ কোনোভাবেই কাটবে না।"

নবম প্রতিষেধক : অনুধাবন করুন, আপনার ওপর যে বিপদটা এসেছে তা কোনোভাবেই এড়ানোর ছিল না। এটা এমন একটা ব্যাপার, যা পৃথিবী এবং মহাকাশ সৃষ্টির হাজার হাজার বছর পূর্বে লেখা হয়ে গিয়েছিল, তাই আপনার অন্তরকে স্বস্তি পেতে দিন। আল্লাহ বলেন,

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝٢٢

"পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর এমন কোনো বিপদ আসে না; যা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"[২]

এমনকি আল্লাহ প্রথমেই কলম সৃষ্টি করে সেটাকে লিখার নির্দেশ দেন। কলমটি যখন জানতে চাইল তাকে কী লিখতে হবে, বলা হলো, "কিয়ামাত পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টির তাকদীর লিখে রাখো।"[৩]

সুতরাং আমরা আতঙ্কিত হই বা স্বাভাবিক থাকি না কেন, আল্লাহর নির্ধারণ-করা বিষয় ঘটবেই। তাই অযথা দুশ্চিন্তা করে নিজের দুর্ভোগ বাড়াবেন না। আলি ﵁ এ সম্পর্কে বলেন,

'যদি তুমি ধৈর্যধারণ করো, আল্লাহর ফায়সালা অবশ্যই প্রকাশিত হবে এবং তুমি পুরস্কৃত হবে। অন্যথায় যদি তুমি অধৈর্য হও, তবুও আল্লাহর ফায়সালা

---

[১] সূরা আশ-শূরা, ৪২ : ৩০
[২] সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২২
[৩] তিরমিযি, আস সুনান

ঘটবেই। কিন্তু তখন তুমি গুনাহগার হয়ে যাবে।'[১]

দশম প্রতিষেধক : মানুষকে যে-কোনো উপায়ে সাহায্য করার মাধ্যমে আপনার দুশ্চিন্তার মোকাবিলা করুন। যদি জীবনকে অসহ্য মনে হয়, একজন ক্ষুধার্ত লোককে খুঁজে বের করুন এবং তাকে খাওয়ান। কাউকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ধার দিন, বিষণ্ণ মানুষগুলোকে সান্ত্বনা দিন। এমনকি একটি জনাকীর্ণ-কক্ষে আপনার পাশে কোনো ভাইকে বসার জায়গা করে দেওয়ার মতো তুচ্ছ কাজও আপনার অন্তরকে প্রফুল্ল করতে একটি বড় ভূমিকা পালন করবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় : মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিয়ো। তা হলে আল্লাহর তোমাদের জন্য (জান্নাতে) স্থান প্রশস্ত করে দেবেন।”[২]

মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রশস্ত করে দিন; বিনিময়ে আল্লাহ আপনার অন্তর, সম্পদ, স্বাস্থ্য এবং কবরকে প্রশস্ততা দান করবেন।

একাদশ প্রতিষেধক : সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন ইলম এবং যিকরের মজলিসসমূহে অংশগ্রহণ করার। আমরা সাধারণত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় জনসমাগম এবং কল্যাণময় জায়গাগুলো থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে ফেলি, যা আমাদের ক্ষতকে শুধু গভীর করে। যে প্রশান্তি হারানোর অভিযোগ আপনি করেন, সেটা তো কেবল মাসজিদেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। রাসূল ﷺ বলেন,

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده

‘যখনই কোনো মানুষ আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো একটি ঘরে কুরআনের

[১] আল-মাওয়ারিদি, আদাব আদ-দুনিয়া ওয়াদ্দীন
[২] সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ১১

জ্ঞান অর্জনে একত্র হয়, তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল হবে, রহমত তাদের ঘিরে রাখবে, ফেরেশতারা তাদের আবৃত করে রাখবেন এবং আল্লাহ তাদেরকে স্মরণ করবেন।"[১]

যখনই আপনি অনুভব করবেন দুশ্চিন্তা আপনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে তখনই আপনার কোনো বন্ধুকে আপনার সাথে কুরআন তিলাওয়াত এবং তাফসীর অধ্যয়নের জন্য মাসজিদে আমন্ত্রণ করুন। এর ফলে খুব সহজেই আপনি আপনার অন্তরের পরিবর্তন অনুভব করতে সক্ষম হবেন।

দ্বাদশ প্রতিষেধক : আল্লাহর স্মরণকে এমন একটি দুর্গে রূপান্তর করুন যেখানে আপনি আশ্রয় নিতে পারবেন। প্রত্যেক বিশ্বাসীই উদ্বেগ দূরীকরণে এর সর্বোচ্চ গুরুত্ব স্বীকার করে নেবে। আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ-কে বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

"আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কুরআন নাযিল করেছি। অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্যে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোনো পাপিষ্ঠ কাফিরের আনুগত্য করবেন না। এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন। রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সাজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"[২]

এই আয়াতগুলো সম্পর্কে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সকাল-সন্ধ্যায় যিকর করতে আদেশ করেছেন, কেননা আল্লাহর স্মরণই ধৈর্যশীল হতে সবচেয়ে উত্তম সহায়ক। তাকে রাতে সালাতের মাধ্যমে ধৈর্যাবলম্বনের আদেশ করা হয়েছে। কেননা রাতের সালাতগুলো তাঁর দিবসের দায়িত্বপালনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং এটা তাঁর শক্তির উৎস হিসেবেও কাজ করে।"[৩]

কল্পনা করুন মিশরের ফিরআউনের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছনোর মতো বিশাল দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার কথাটা। সে ওই ব্যক্তি, যে কিনা প্রভুত্ব দাবি করে

[১] আবূ দাউদ, আস সুনান : ১৪৫৫
[২] সূরা ইনসান, ৭৬ : ২৩-২৬
[৩] জামি' আর রাসাইল

বসেছিল। সুতরাং চিন্তা করুন মূসা এবং হারূন ﷺ-কে কীভাবে সেই দুশ্চিন্তা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ বলেন,

اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾

"তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলী-সহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য কোরো না।"[১]

আল্লাহর যিকরই একমাত্র অস্ত্র, যা তাদেরকে পৃথিবীর সবচেয়ে পাপী শাসককে মোকাবিলা করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। শাইখ আস সা'দি এ ব্যাপারে বলেন, "আল্লাহর স্মরণ প্রতিটা ব্যাপারে সহায়তা দান করে। এটা মানুষকে স্বস্তি দান করে এবং তাদের বোঝাকে হালকা করে।"[২]

ত্রয়োদশ প্রতিষেধক : আল্লাহ হয়তো আপনাকে বিপদ দিয়েছেন তার চেয়েও বড় কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। আপনার ব্যাপারে যা পরিকল্পনা করা হয়েছে, সেটা অনুমান করাও আপনার পক্ষে অসম্ভব।

আলেমরা এক রাজা আর তার মন্ত্রীর কথা প্রায়শই বর্ণনা করে থাকেন। মন্ত্রী ছিলেন একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, যিনি বিপদ এলেই এই কথাটির পুনরাবৃত্তি করতেন : "الخيرة فيما اختاره الله"

"আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।"

একদিন একসাথে খাওয়ার সময় রাজা তার হাত খুব বাজেভাবে কেটে ফেললেন। সব সময়কার মতোই মন্ত্রী বলে উঠলেন, "আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।"

রাজা মশায় মন্ত্রীর কথায় খুব অপমানিত বোধ করলেন। তিনি ভাবলেন, মন্ত্রী তার এমন দুর্দশায় মজা নিচ্ছে! তাই তিনি রাগে-ক্ষোভে মন্ত্রীকে বন্দি করলেন। মন্ত্রী তার বন্দিত্বের ব্যাপারেও—'আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন'—বলে প্রতিক্রিয়া দেখালেন।

রাজা তার বিনোদনের বেশিরভাগ সময়ই মন্ত্রীর সাথে শিকারে কাটাতেন। কিন্তু মন্ত্রী জেলে বন্দি হবার পর তিনি একাই শিকারে গেলেন। তিনি শিকারের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে কখন যে নিজের সীমানা পেরিয়ে মূর্তিপূজারিদের সীমানায় গিয়ে পৌঁছলেন, সেটা টেরও পেলেন না। তারা তাকে ধরে ফেলল, এরপর বন্দি করল।

[১] সূরা ত্ব-হা, ২০ : ৪২
[২] তাফসীর আস সা'দি

তার পর তাদের সবচেয়ে বড় দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেবার জন্য নিয়ে গেল। তাকে মাটিতে শুইয়ে যেই ছুরি দিয়ে গলাটা কাটতে গেল, তখনই রাজার হাতের জখম তাদের দৃষ্টিগোচর হলো। আর এই খুঁতের কারণে তারা তাকে বলি দেওয়ার অযোগ্য মনে করে ছেড়ে দিলো।

রাজা তার প্রাসাদে ফিরলেন। তিনি অনুধাবন করতে পারলেন—'আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন।' তাই রাজা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে মুক্ত করে দিলেন এবং সম্পূর্ণ ঘটনা তাকে খুলে বললেন। তিনি মন্ত্রীকে বললেন, "জখমের মাধ্যমে আমার কী কল্যাণ হয়েছিল, এখন আমি তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমাকে বন্দি করার সময়ও তুমি বলেছিলে 'আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন', এই বন্দিত্বের মধ্যে কী কল্যাণ ছিল তোমার জন্য?"

জবাবে মন্ত্রী জানতে চাইলেন, "শিকারের সময় সচরাচর কে আপনার সাথে থাকত?" রাজা বললেন, "তুমি।" মন্ত্রী তখন বললেন, "আমাকে যদি বন্দি না করতেন তবে আজকেও আপনার সাথে আমি থাকতাম, আর তখন আপনার বদলে আমাকেই বলি দেওয়া হতো।"

যখনই আপনি কোনো দুর্বিপাকে পতিত হন, 'আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন'—বাক্যটিকে আপনার স্লোগানে পরিণত করুন। যেহেতু আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন :

وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـًٔا وَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦

"পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো-বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।"[১]

চতুর্দশ প্রতিষেধক : সমস্যা ততটুকুই বড় হয়, যতটুকু আপনি সেটাকে বড় করেন। আরবিতে একটা প্রবাদ আছে :

هونها وتهون

"তালকে তিল করা।"

[১] সূরা বাকারা, ০২ : ২১৬

অন্যভাবে বলতে গেলে এর মানে হলো, আপনার সমস্যাকে যতটা সম্ভব সঙ্কুচিত করুন। আর এটা নিম্নলিখিত উপায়ে করা সম্ভব :

- এর থেকেও খারাপ অবস্থার কথা চিন্তা করে আপনার সমস্যাকে ছোটো মনে করুন। দীর্ঘসময় ধরে দুর্বিপাকে থেকেও মুষড়ে না পড়া এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনি কীভাবে এত স্থিরতা এবং ধৈর্যাবলম্বন করতে পারেন?" তিনি বললেন, "আমি কোনো কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার সাথে সাথেই জাহান্নামের তীব্র শাস্তির কথা স্মরণ করি। আর তখন সেই কষ্টটাকে আমার কাছে মাছির মতোই তুচ্ছ মনে হয়।"
- আপনার সমস্যাটা যে সত্যিই ততটা মারাত্মক নয়, এর জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজের কষ্টটাকে কমিয়ে আনুন। যদি আপনি একটি চোখ হারিয়ে থাকেন, তবে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন এই কারণে যে, আপনি উভয় চোখই হারাননি। যদি আপনার একটা হাত ভেঙে যায়, তৎক্ষণাৎ আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যে, অন্তত আপনার মেরুদণ্ড ভেঙে যায়নি।

বিখ্যাত আবিদ মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি একবার ত্বকের ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার বন্ধু এটা দেখে ভীত হয়ে পড়লেন। তখন মুহাম্মাদ তাকে বললেন, "আল হামদু লিল্লাহ! ক্ষতটা আমার জিহ্বায় কিংবা চোখের কিনারায় হয়নি।"

এক গরিব-অসুস্থ-অন্ধ এবং প্রতিবন্ধী লোককে প্রায় সব সময় বলতে শোনা যেত—"প্রশংসা শুধুই আল্লাহর, যিনি আমাকে তাঁর অনেক বান্দার থেকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন।"

এটা শুনে একজন লোক তাকে বললেন, "আপনার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! আল্লাহ আপনাকে কোন দিক দিয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন?"

অন্ধ লোকটি জবাব দিলেন, "তিনি আমাকে একটা জিহ্বা দিয়েছেন, যা দিয়ে তাঁর যিকর করতে পারি, তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপনকারী হৃদয় দিয়েছেন এবং বিপদে সহিষ্ণুতা অবলম্বনকারী একটা দেহ দান করেছেন।"

- আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন এবং নিজের সমস্যাকে ছোটো ভাবুন, কেননা এই দুর্ভাগ্য আপনার দ্বীনদারিতাকে আক্রান্ত করেনি।

উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেন, "আমার ওপর আপতিত প্রত্যেকটা বিপদের মধ্যে আমি ৪টা কল্যাণ অবলোকন করি :

১) বিপদটা আমার দ্বীনের ক্ষেত্রে ছিল না।

২) আমাকে এই কঠিন পরিস্থিতিতে সংযম অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখা হয়নি।

৩) এর চেয়েও বড় বিপদ হতে পারত।

৪) আর আমি এটার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান আশা করি।"[১]

• আপনার প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামাতের কথা স্মরণ করে বর্তমান সমস্যাটাকে তুচ্ছ মনে করুন। এই বিষয়টা কতই-না দুঃখজনক যে, আমাদের প্রতি বর্ষিত অজস্র নিয়ামাতের ব্যাপারটাতে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমরা শুধু দেখতে পাই সেই একটামাত্র নিয়ামাত, যা থেকে আমাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। এটা কি ঠিক?

যখন উরওয়া বিন যুবাইর ﷺ-এর পা কর্তন করা হয়, তখন ইবনু তালহা ﷺ তাকে বললেন, "আল্লাহ তো আপনার জন্য শরীরের বেশিরভাগ অঙ্গই অক্ষত রেখেছেন; অন্তর, জিহ্বা, দুটো চোখ, দুটো হাত এবং একটা পা।"

উরওয়া ﷺ বললেন, "আপনার থেকে উত্তমভাবে কেউই আমার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেনি।"

কেউ কেউ আর্থিক দুরবস্থার ব্যাপারে অভিযোগ করে থাকেন। তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, "আপনি কি আপনার দৃষ্টিশক্তিকে ১ কোটি টাকার বিনিময়ে দিতে দিতে রাজি?"

তখন জবাব আসে, "না।"

"তা হলে আপনার শ্রবণশক্তিকে?" একই জবাব আসে।

"আপনার বাক্‌শক্তি? আপনার অন্তর?",

প্রতিবারই উত্তর আসে, "না।"

তখন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত, "সত্যি বলতে, আপনি তো একজন কোটিপতি। এরপরেও আপনি কীভাবে দারিদ্র্যের অভিযোগ করতে পারেন?"

• আপনার সমস্যাটাকে তুচ্ছ ভাবুন এটা স্মরণ করে যে, বৈশাখের ঘন-কালো মেঘের মতোই এটা একসময় কেটে যাবে। যাদেরকে পূর্বে অসুস্থতা কিংবা প্রিয় মানুষ হারানোর কষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তাদের কথা চিন্তা করুন। তখন

[১] মানাবি, ফাইদুল কাদীর

তাদের অবস্থা কীরকম ছিল? কেউ কেউ তো নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন আদৌ হবে কি না, এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঠিকই হয়েছিল। তাদের জীবনযাত্রা এগিয়ে গেল। এমনকি একসময়ের হৃদয়বিদারক দুঃখগাঁথা তাদের জন্য সুদূর অতীতে পরিণত হলো।

এখন আপনি যাদেরকে আপনার পাশে হাসতে দেখেন, জীবনকে উপভোগ করতে দেখেন, তারা কি জীবনের কোনো এক মুহূর্তেও বিষাদের ভারে অশ্রুপাত করেনি?

হ্যাঁ, তারা করেছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সবকিছুই বদলে গেছে।

শাইখ আলি আল-তানতাবি বলেন, "অসুস্থতা যাদের হতাশায় নিপতিত করছে; অথবা দারিদ্র যাদের দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলছে; কিংবা পীড়াদায়ক কারাবাস যাদেরকে পরিবার এবং সন্তানসন্ততি থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে; অথবা কোনো জালিম শাসকের জন্য যারা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার; এমন একদিন আসবে যেদিন এই সমস্তকিছুই শুধু তাদের স্মৃতির পাতায় আর বন্ধুদের সাথে পুরনো গল্পের আড্ডাতেই শোভা পাবে।"

- নিজের বিপদটা যে কত তুচ্ছ, সেটা অনুধাবনের জন্য শুধু আপনার চারপাশের মানুষগুলোর যাপিত জীবনের দিকে তাকান। খুব দ্রুত আপনি অনুধাবন করবেন যে, প্রত্যেকটা মানুষই কোনো-না-কোনোভাবে সমস্যায় জর্জরিত।

পঞ্চদশ প্রতিষেধক : দুনিয়ার প্রতি এমন কোনো আশা পোষণ করবেন না, যার জন্য এটাকে সৃষ্টিই করা হয়নি। পরীক্ষা জিনিসটা যে খুব সহজ কোনো অভিজ্ঞতা নয়, এটা সবারই জানা। আর এই দুনিয়াটা পরীক্ষা ছাড়া আর কীই-বা হতে পারে? তাই যে কয়টা দিন পৃথিবীতে শান্তিতে থাকছেন সেগুলোকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মনে করুন। কারণ আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ۝

"নিশ্চয় আমি মানুষকে কষ্টের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।"[১]

গর্ভধারণকালীন কষ্ট, খাটুনির সময়কার কষ্ট, জ্ঞানার্জনের পেছনে দেওয়া পরিশ্রম, চাকুরি, বিয়ে এবং সন্তান লালনপালনের কষ্ট, দুর্বল স্বাস্থ্য, বার্ধক্য এবং মৃত্যুকালীন তীব্র যন্ত্রণা—এসব তো প্রায় প্রতিটা মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

[১] সূরা বালাদ, ৯০ : ৪

যে-কেউই যদি কোনোরকম সমস্যাবিহীন জীবন আশা করে, অথবা ধারণা করে একমাত্র সে-ই দুর্দশাগ্রস্ত, অথবা কল্পনা করে সে-ই সবচেয়ে বেশি কষ্টের মধ্যে আছে, সে আসলে ভুল ভাবছে। কেননা প্রত্যেককেই পরীক্ষা করা হচ্ছে।

যেমনটা ইবনে উআইনা ﷺ বলেছেন,

> “এই দুনিয়াটা বিষাদময়। তাই যে অনাকাঙ্ক্ষিত দিনগুলো আপনি স্বস্তির মধ্যে কাটান, সেগুলোকে বোনাস হিসেবে নিন।”[১]

আবদুর রহমান আন নাসির ছিলেন আন্দালুসিয়ার একজন বিখ্যাত গভর্নর। তিনি স্বস্তিতে অতিক্রান্ত দিনগুলো নোট করে রাখতেন। তিনি চরম কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতেন এবং যারা তার রাজ্যকে অস্থিতিশীল করে তুলতে চেয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে নিদারুণ সংগ্রাম করেছিলেন। যখন তিনি মারা গেলেন, তখন শত্রুরা তার নোট করা স্বস্তির দিনগুলোর হিসাব দেখতে পেল। তারা মাত্র ১৪ দিনের হিসাব পেল, যদিও তিনি ৫০ বছর সময়কাল আন্দালুসিয়াকে শাসন করেছিলেন।[২]

তাই দুনিয়াকে একটা অস্থায়ী পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে মেনে নেওয়ার জন্য নিজেকে প্রশিক্ষিত করে তুলুন।

ইমাম আহমাদ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, “আমরা কবে শান্তি পাব?”

তিনি উত্তর দিলেন, “জান্নাতে প্রথম পদক্ষেপটি রাখার সাথে সাথেই।”

সব সময় এই উত্তরটি সামনে রাখুন। দেখবেন, কষ্ট কমে যাবে।

আমি আল্লাহর কাছে দুআ করছি, তিনি যেন আমাদের জান্নাতে সেই পদক্ষেপ রাখার তৌফিক দান করেন। কিন্তু জান্নাতে পদার্পণের আগপর্যন্ত আপনার প্রতি ছুড়ে দেওয়া জীবনের প্রত্যেকটা সম্ভাব্য পরিস্থিতির সাথে আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে। এটাই হচ্ছে দুনিয়া, আর আমরা সবাই একই নৌকার যাত্রী।

আল্লাহ যেন এই ১৫টা প্রতিষেধককে তাঁর কাছে পৌঁছনোর এই ক্ষণস্থায়ী যাত্রায় আমাদের জন্য স্বস্তির মাধ্যম বানিয়ে দেন।

সত্যিই এটা আমাদের দুর্বল সত্তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁকে ছাড়া আর কোনো কিছুর সাথেই আমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ জুড়ে দেননি। স্ত্রী-স্বামী-চাকরি-সন্তানসন্ততি-দেশ-সম্পদ অথবা অন্য যে-কোনো কিছুই হারিয়ে ফেললে

---

[১] ইবনে আবদিল বার, বাহজাতুল মাজালি
[২] আয-যাহাবি, সিয়ারা আ'লামিন নুবালা

পুনরায় প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু আল্লাহ যদি কারও জীবন থেকে হারিয়ে যান, তবে কীসের মাধ্যমে তাঁকে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব?

সত্যিকারের দুঃখ তাই অপূরণীয় সেই সত্তাকে হারানো ছাড়া ওপরের আর কোনোটা হারানোতেই নয়।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“যে মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করবে—হোক সে পুরুষ কিংবা নারী—আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। এবং তারা যা করত, তার তুলনায় অবশ্যই আমি উত্তম প্রতিদান দেবো।”[১]

[১] সূরা নাহল, ১৬ : ৯৭

লেখক পরিচিতি

● **মূসা জিবরীল :**

ফিলিস্তিন বংশোদ্ভূত অ্যামেরিকান নাগরিক। গ্র্যাজুয়েশান করেছেন মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে। তৎকালীন আরবের বড় বড় আলেমদের দরসে বসে ইলমে-দ্বীন শিক্ষা করেছেন। তাঁর ইলম থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে শাইখ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ অ্যামেরিকার মুসলিমদের উৎসাহ দিতেন। সত্যের পথে অবিচল থাকার জন্যে তিনি অ্যামেরিকার সরকারের রোষানলে পড়েছেন অনেকবার। বিখ্যাত আলিম শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল তাঁরই সন্তান।

● **আলি হাম্মুদা :**

ইংল্যান্ডের নাগরিক। ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্ট অব ইংল্যান্ড থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেন তিনি। এরপর পাড়ি জমান মিশরে। বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীআর ওপর বি.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি লন্ডনের একটি ইসলামিক সেন্টারের সিনিয়র গবেষক ও লেকচারার পদে কর্মরত আছেন। তার লিখিত বইগুলোর মধ্যে The Daily Revivals, The Ten Lanterns অন্যতম। সম্প্রতি The Daily Revivals বইটি 'হারিয়ে যাওয়া মুক্তো' নামে সমর্পণ প্রকাশন থেকে অনূদিত হয়েছে।

● **শাওয়ানা এ. আযীয :**

জন্মেছেন ইন্ডিয়ার মুম্বাইয়ে। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সালে। ইসলামিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর দাওয়াহ ইলাল্লাহ-র পথে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। লেখক, অনুবাদক ও লেকচারার হিসেবে তিনি সমাদৃত। তার অনূদিত বইয়ের মধ্যে আছে Faith in the Angels, We believe in Allah, The four foundations of shirk ইত্যাদি।

বিপদ এলে হতাশ হবেন না। কারণ, প্রত্যেকটি বিপর্যয় তো পূর্বনির্ধারিত। যখন আল্লাহ কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে ফেলেছেন, তখন কেউ কি তা বদলাতে পারবে? আপনার পিতা-মাতা-ভাই-বোন-আত্মীয়-স্বজন, এমনকি সারা বিশ্বের মানুষ একত্র হয়ে চেষ্টা করলেও তা বদলাতে পারবে না। সুতরাং শান্ত হোন।

যখন আপনি তাকদীরের ব্যাপারটি হৃদয়ে বসাতে পারবেন, তখন অন্ধকারতম পরিস্থিতিতেও আশার আলোকচ্ছটার সন্ধান পাবেন। দুর্গন্ধময় দিনেও সুগন্ধের ছোঁয়া পাবেন। পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠলেও অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করতে পারবেন। আপনি কী পাবেন, কী হারাবেন—তা তো আল্লাহই নির্ধারণ করে রেখেছেন, আপনি নন। তাই যখন কোনো কিছু চাওয়ার পরেও পাবেন না, তখন জেনে রাখবেন এই জিনিস আপনার নয়। আর যে জিনিস আপনারই নয়, তা আপনি কীভাবে পাবেন?